মেস্‌মেরিজম্‌

বা

শক্তি চালনা।

হোমিওপ্যাথিক্‌-ঔষধের-সম্বন্ধনির্ণয় ও প্রতিকার,
সংক্ষিপ্ত-ভৈষজ্য-রত্ন, হোমিওপ্যাথিক্‌-ঔষধের-সাদৃশ্য,
পকেট্‌-ভৈষজ্য-সোপান, টাইফয়েড্‌-ফিবার-চিকিৎসা,
বৃহৎ-নিউমোনিয়া-সন্দর্ভ, ওলাউঠা-বিজয়, পকেট্‌-
রিপার্টারি, বসন্ত ও হাম চিকিৎসা, প্লেগ-
চিকিৎসা, চিকিৎসা-সেতু, এপেণ্ডি-
সাইটীস্‌, প্রসূতি-সহায়,
ইত্যাদি প্রণেতা—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও
প্রকাশিত।

হাং সাং বৈঁচি জেলা হুগলি।

১৩৩৯ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা "শ্রীরাম প্রেস" হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাচস্পতি দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে এই মেস্‌মেরিক্‌ বিষয় লইয়া বহু বহু রোগের চিকিৎসা হইয়া গিয়াছে। আজকাল সে সকল কথা অলীক্‌ ও গল্প হইয়া উঠিয়াছে। মন্দলোকের দুরভিসন্ধিতে ইহা ভারতে প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে। অশিক্ষিত মহলে আজও কিছু কিছু আছে। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত তাঁহাদের কাছে থাকিলেও এরূপ পুস্তক না থাকায় নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আছে। সেই অভাব পূরণ জন্য আজ মেস্‌মেরিজম্‌ নামক পুস্তক বাহির করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু গ্রন্থ কর্ত্তার সাহায্য লইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ, বাধ্য ও ঋণী থাকিলাম।

এমন কি আজ ভারতবাসীও তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ; তাহার সন্দেহ নাই। ইতি—

১৩৩৯ সাল।
১৮ই জ্যৈষ্ঠ,
ইং ১৯৩২
১লা জুন,

গ্রন্থকর্ত্তা।

মেস্‌মেরিজম

বা

শক্তিচালনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীব মাত্রের শরীরে জগদীশ্বর এমন একটী শক্তি দিয়াছেন; যাহার দ্বারা আমরা আপনাপনি বিনা চেষ্টায় রোগমুক্ত হইতে পারি।

সমস্ত জীব জন্তু নীচ জাতি বিনা চিকিৎসায় বিনা ঔষধে সেই শক্তি দ্বারা রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে ঔষধ সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধে রোগ আরোগ্য করে না। যেখানে বা যে যন্ত্রে রোগ হইয়াছে; রোগ আরোগ্য-কারিণী-জীবনী-শক্তি তথায় সেই রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিতে থাকে। সেই জীবনীশক্তি অপেক্ষা রোগের ক্রিয়া ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইলে ঐ জীবনী শক্তির দ্বারাই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়; ঔষধের অপেক্ষা করে না বা ঔষধের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যদি সেই রোগ-আরোগ্য-কারিণী-জীবনী-শক্তির ক্ষমতা রোগ অপেক্ষা ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হয়, তবে সেই রোগ আরোগ্য করিতে তাহার ক্ষমতায় কুলায় না। কাজেই

তখন আর সে আরোগ্য করিতে পারে না; তখন ঔষধের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঔষধ তখন রোগ-আরোগ্য-কারিণী জীবনী-শক্তির উপর কার্য্য করিয়া তাহার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহার দ্বারা রোগ আরোগ্য করিয়া লয়। তৎকালে ঔষধ সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধে না হইয়া পরম্পরা সম্বন্ধে রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে, সুতরাং ঔষধেও রোগ আরোগ্য করে, কিন্তু যেখানে ঐ রোগ-আরোগ্য-কারিণী-জীবনীশক্তি একেবারে লোপ হইয়াছে, যাহার শরীর হইতে সেই শক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও আরোগ্য করিতে পারে না, সুতরাং তখন তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই জন্যই মানব ঔষধ দ্বারা চিরজীবি হইতে পারে না।

এক্ষণে আর একটী ভাবিবার কথা—যে যন্ত্রে রোগ হইয়াছে, জীবনীশক্তি সেই যন্ত্রের পীড়া আরোগ্য জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, সদৃশ মতে ঔষধ সেই স্থানের জীবনীশক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া বা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে রোগ নাই; রোগ আরোগ্য-কারিণী-জীবনীশক্তি সেখানে আরোগ্যের চেষ্টা কেন করিবে, সুতরাং সুস্থ যন্ত্রে রোগ আরোগ্য কারিণী-শক্তির কোন প্রকার চেষ্টা বা ক্রিয়া না থাকায়

সদৃশ মতের ঔষধও তথায় ক্রিয়াশীল নহে। তথায় যখন রোগ আরোগ্য-কারিণী-শক্তির চেষ্টা নাই, তখন, ঔষধ কাহার সাহায্য জন্য তথায় সচেষ্ট বা ক্রিয়াশীল হইবে? কাজেই সুস্থ যন্ত্রে ঔষধের সূক্ষ্ম মাত্রা ক্রিয়া করে না অর্থাৎ সুস্থ যন্ত্রে ডাইলুটেড্ বা শক্তিকৃত ঔষধ নিষ্ক্রিয়। তথায় কোন অনিষ্ট করে না, সত্য কথা; কিন্তু যেখানে রোগ আছে; রোগ-আরোগ্য-কারিণী-জীবনী-শক্তি রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিতেছে; অথচ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠিতেছে না, সেখানে প্রকৃত সুনির্ব্বাচিত ঔষধে আরোগ্য-কারিণী-শক্তির বল বৃদ্ধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারে বা করিয়া থাকে। তেমন স্থলে ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট করিয়া দিবে। তখন ঔষধের বিপরীত ক্রিয়া জনিত আরোগ্য-কারিণী-শক্তি ক্ষীণ বা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, কিম্বা সেই শক্তিকে বিপথে চালিত করিয়া রোগ আরোগ্যের প্রতিকূলে কার্য্য করিয়া ভীষণ অনিষ্ট করিয়া দিবে। তখন তাহাকে বাঁচান কঠিন হইবে, বা অসাধ্য হইবে, হিত করিতে গিয়া ভ্রম বশতঃ অহিত করিয়া বসিবে। এক্ষণে বুঝা গেল, সদৃশ ঔষধ কোথায় উপকার করে; আর কোথায় অপকার করে।

বুঝিলাম—যেখানে রোগ হইয়াছে, রোগ আরোগ্য-কারিণী-জীবনীশক্তি প্রাণপণে সেই রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিতেছে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ তথায় অমৃততুল্য হইয়া জীবনীশক্তির দ্বারা রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়, কিন্তু যেখানে রোগ নাই, কাজেই আরোগ্য শক্তিও আরোগ্যের চেষ্টা করিতেছে না, তেমন স্থলে ঔষধ নিষ্ক্রিয়, এবং যেখানে, রোগ আছে, আরোগ্য কারিণীশক্তি সচেষ্ট, তথায় কুব্যবস্থায় ভীষণ অনিষ্ট করিয়া দিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, সুতরাং হোমিও-প্যাথিক্‌ শক্তিকৃত ঔষধে রোগ আরোগ্য করে,এবং পীড়িত অঙ্গে কুব্যবস্থায় দারুণ বা ভীষণ অনিষ্টকরে এবং সুস্থ যন্ত্রে অপকার করে না। এ সমস্তই সত্য কথা। আর যাহার জীবনীশক্তি নাই, তাহার পক্ষে কোন ঔষধই কার্য্যকারী নহে, তাই মানুষ মাত্রেই কোন না কোন দিন মরিবেই মরিবে, অমর হইবে না; তাই ভগবান বলিয়াছেন—

জাত ব্যক্তির মৃত্যু ধ্রুবসত্য।

কেহ কেহ মনে করেন বা বলিয়া থাকেন, হোমিও-প্যাথিক্‌ ঔষধ দ্বারা রোগারোগ্য হওয়াটা ব উপকার হওয়াটা কেবল রোগীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

এই কথাটী মোটের উপর, সকল প্রকার চিকিৎসার উপরই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঔষধের ক্রিয়ার উপর কিছু মাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

দুগ্ধ পোষ্য শিশু বা পশুর উপর যখন ঔষধের ক্রিয়া দেখা যায়, রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়; তখন কি করিয়া বলিব যে, কেবল মাত্র বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয়? দুগ্ধ পোষ্য শিশু, ঘোড়া, গরু বা কুকুরের কি **বিশ্বাস বা অবিশ্বাস** আছে। তবে একথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা নয়, উড়াইয়া দিয়া হাঁসিবার কথা নহে। কখন কখন দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা রোগারোগ্য না হয়, এমন কথাই নহে। **আমি নীরোগ হইয়াছি**, এই দৃঢ় বিশ্বাসেও রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাকে **মানসিক আরোগ্য** (Mental cure) কহিয়া থাকে। দেবতার নিকট বা দেবালয়ে ধন্না বা হত্যাদিয়া অনেকের কঠিন রোগ আরোগ্য হইতেও তো দেখা যায়, তন্মধ্যে **মানসিক আরোগ্যই** বেশী। ইহা বাদে ইহার ভিতর আরও গুঢ় কথা আছে। সকলেরই গুরু আছেন। যিনি দীক্ষিত হন নাই, তাঁহারও গুরু আছেন, বলিয়া মনে করি; সূক্ষ্ম ভাবে সেই সূক্ষ্ম শরীরি গুরু, সদাই আমাদের বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চাহেন বা

ইচ্ছা করেন, সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু তিনি যে স্বরে বলেন, সে স্বরে আমাদের কাণ বাঁধা নাই; তাই শুনিতে পাই না; কখন কখন অনুভব করিয়াও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিপদে পড়ি। তাঁহার ইঙ্গিত গ্রাহ্য না করিয়া বিপদে পড়ি। তাঁহার ইঙ্গিত গ্রাহ্য না করাই অসাবধান হওয়ার হেতু হয়। সেই উপদেশ না শুনিয়াই বিপদাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া কষ্ট পাইতে থাকি।

যখন আমরা দেবালয়ে ধন্না বা হত্যা দিবাব কালিন একাগ্রমনে নিজের মঙ্গল কামনায় কিম্বা সন্তান সন্ততির মঙ্গল প্রার্থনায় নিদ্রিত হইয়া পড়ি, তখন গুরুর আদেশ শুনিতে পাই, যেমন নিদ্রিতাবস্থায়, সুষুপ্তী অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, সুষুপ্ত্যাবস্থায় সেই মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাষা শুনিতে পাই, তদ্রূপ একাগ্রমনের নিদ্রিতাবস্থায় গুরুর কথাও শুনিতে পাই। সেই সময় রোগ আরোগ্য উপযোগী ব্যবস্থা তিনি দিয়া থাকেন। আবার প্রত্যেক দেবালয়-স্থানে সময় সময় **সূক্ষ্ম শরীরি মহাত্মা** থাকেন, তাঁহারা দয়া করিয়া রোগারোগ্য উপযোগী উপদেশ দিয়া থাকেন এবং তাহাতেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। **আরোগ্য হইয়াছি**, দৃঢ় বিশ্বাসে আরোগ্য হওয়া অসম্ভব নহে;

আরোগ্য হইয়া থাকে। তা বলিয়া ঔষধের ক্রিয়া নাই, শিশু বাক্য বা প্রলাপ বাক্য মাত্র।

তবে ইহা ঠিক যে, বিশ্বাস দ্বারা ঔষধের ক্রিয়াকে স্থির করে, বৃদ্ধি করে ও স্থায়ী করে। 'আমি আরোগ্য হইতেছি, হইয়াছি বা এই ঔষধে নিশ্চয় আরোগ্য হইব, এই বিশ্বাসে **আরোগ্যকারিণী-জীবনীকে** বৃদ্ধি করিতে পারে।

পাঠকমহাশয়গণ অবগত আছেন যে, ঔষধের ক্রিয়া দুই প্রকার, ঔষধ উদরস্থ হইবামাত্র যে ক্রিয়া প্রকাশ হয়; তাহাকে ঔষধের **সাক্ষাৎ ক্রিয়া** (Action) এক্‌শন্‌ এবং সাক্ষ্যাৎ ক্রিয়ার অবসানে আর একটী তাহার ঠিক বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ হয়, তাহাকে **পরম্পরিত ক্রিয়া** (Reaction) রিয়াক্‌শন্‌ কহে। যেমন মদ খাইলে প্রথমে উত্তেজনা প্রকাশ হয়, পরে অবসাদ আসিয়া পড়ে, ইহাকে মাতালেরা মদের খোঁয়ারি কহে। তদ্রূপ সকল দ্রব্যেরই খোঁয়ারি আছে; ইহাই তাহার পরম্পরিত ক্রিয়া। এইটী প্রাকৃতিক নিয়ম।

প্রত্যেক দ্রব্যের এই দুইটী ক্রিয়া আছে। এমন কি আমাদের দৈনিক খাদ্যেরও ঐ দুইটী ক্রিয়া আছে। খাদ্য খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়,—আবার না খাইলে ক্ষুধা হয় না,

কঠিন রোগ আরোগ্যের পর না খাইলে আর ক্ষুধা ভাল হয় না, এই যে জনরব আছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। খাদ্যে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, ইহাত খাদ্যের সাক্ষ্যাৎ ক্রিয়া। পরে যখন সেই খাদ্য হজম হইয়া যায়, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বেশী ক্ষুধা হয়, সেইটী খাদ্যের পরম্পরিত ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। আবারও দেখা যায়, যে খাদ্য যে না খায়, তাহা খাইলে তাহার হজম হয় না বা তাহাতে রুচি হয় না।

আমাদের শরীর অসংখ্য জীবসমষ্টি। খাদ্যানুসারে পৃথক পৃথক ব্যক্তির শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। অনেকক্ষণ অনাহারে থাকিলে সেই সব জীব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সেই দ্রব্য খাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, সুতরাং সেই খাদ্যে তাহার রুচি হয়। যাহা খায় নাই সে জাতীয় জীব তাহার শরীরে না থাকায় তাহা খাইতে রুচি হয় না বা খাইলে অসুখ হয়। এসব বিবেচনা দ্বারা রোগীর পথ্য নির্ণয় করিতে হয়। যে খাদ্য, যে কখন খায় নাই, তাহাকে তাহা খাইতে দিলে বমন হয় বা শরীর অসুস্থ হয়। তাই নূতন খাদ্য খাইতে আরম্ভ করিলে প্রথম প্রথম অসুখ হয়; যখন সেই জীব শরীরে জন্মাইয়া যায়, তখন তাঁহার তাহা সহ্য হয়। এই ব্যাপারটী জীব জন্তুদের প্রতি তাকাইলে বেশ বুঝা যায়। মাংসভোজী জীব শাঁকসব্জি

খাইতে চাহে না, আবার শাকসব্জী ভোজী জীব কখনই মাংস খায় না কিম্বা খাওয়াইলে অসুস্থ হইয়া পড়ে।

কাজেই রোগীর খাদ্য ব্যবস্থাকালে তাহার অভ্যস্ত ও জাতিগত খাদ্যবিচার দরকার। পুঁথীর গৎ আওড়াইলে চলিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে জীবনীশক্তির দ্বারা জীব আপনাপনি রোগমুক্ত হয়, সেই প্রকৃতি শক্তিকে শত সহস্র বার প্রণাম করি। এই শক্তিরবিষয় চিকিৎসকের খুব ভালরূপে জানা থাকা দরকার এবং তাহা কেমন করিয়া চালিত করিতে পারা যায়, সবিশেষ জানা থাকা ও আয়ত্তাধীনে রাখা দরকার। চিকিৎসকের মধ্যে যাঁহারা ঐ শক্তিকে নিজ শরীর হইতে রোগীর শরীরে সুশৃঙ্খলে চালিত করিতে জানেন, তিনিই অতি সুচিকিৎসক, রোগ্যারোগ্যে অন্য চিকিৎসক অপেক্ষা ক্ষমতা বিশিষ্ট। যখন রোগীর জীবনী অতি ক্ষীণ, অতি দুর্ব্বল, হয় ও ঔষধের দ্বারা ভালরূপে প্রতিক্রিয়া হইতেছে না, তখন

শক্তিচালন-বিদ্যা পারদর্শী চিকিৎসক নিজ শরীর হইতে ঐ শক্তি রোগীর শরীরে চালিত করিয়া, রোগীর ক্ষীণ জীবনীশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া বা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ঔষধকে তীব্র ক্রিয়োপযোগী করিয়া লইতে পারেন। ইহা আমার অলীক বা ঘরগড়া কথা নহে। কোন রোগীর শরীরে রক্ত কমিয়া গেলে যেমন অপরের শরীর হইতে **রক্ত চালিত (ট্রানস্‌ফিউজন্‌)** করিয়া সেই রোগীকে বাঁচান যায়, তদ্রূপ নিজ শরীরস্থ তেজঃ বা জীবনী-শক্তি চালিত করিয়া রোগীর ক্ষীণ জীবনীশক্তির বল বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে আরোগ্য করা যায়।

মানব শরীরে তিন জাতীয় শিরা আছে।

১। একপ্রকার ফাঁপা শিরা, তদ্বারা লাল রক্ত সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হইয়া থাকে; ইহাদের **ধমনী** বা (Artery) **আর্টেরি** কহে। ইহার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বাঙ্গে চালিত হয়।

২। আর এক জাতীয় ফাঁপা শিরার মধ্য দিয়া কাল রক্ত ধীরে ধীরে হৃদ্‌পিণ্ডাভিমুখে যাইতে থাকে; তাহাদের **শিরা** বা (Viens) **ভেইন্‌স্‌** কহে।

৩। আর এক প্রকার সাদা নীরেট দড়ির মত শিরা আছে, তাহাদের স্নায়ু বা (Nerves) **নার্ভস্** কহে।

মেরুদণ্ড বা তাহার নিকটস্থ গ্রন্থি হইতে একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়া মানব শরীরের উত্তাপ সম্পাদন করে, এই পদার্থ ঐ স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা চালিত হইয়া আমাদের চৈতন্য সম্পাদন এবং সকল যন্ত্রকে ক্রিয়াশীল করায়। এই সকল স্নায়ু দ্বারা আমাদের ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, আস্বাদন শক্তি, শ্রবণশক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য এবং কথা, হাত, পাদ, পায়ু ও উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকে। এই পদার্থকে **ম্যাগ্‌নেটীক্ শক্তি** কহিয়া থাকে।

ইহাই জীবের **এনিমেল্-ম্যাগ্‌নেটীজম্** নামে বিখ্যাত।

মানবের খাদ্য তিন প্রকার অর্থাৎ তিন প্রকার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট। ১। সাত্ত্বিক খাদ্য। ২। রাজসিক খাদ্য। তামসিক খাদ্য।

খাদ্যানুসারে মানবের প্রকৃতি গঠিত হয়। যাহার যেমন স্বভাব বা যেমন প্রকৃতি এই এনিমেল্-ম্যাগ্‌নেটীজম্ তাহার সেই গুণবিশিষ্ট; সুতরাং যাহার যেমন বুদ্ধি, যেমন স্বভাব তাহার এই এনিমেল্-ম্যাগ্‌নেটীক্ শক্তিও সেই প্রকৃতি

বিশিষ্ট কেন না হইবে? এই এনিমেল্‌-ম্যাগ্‌নেটীক্‌ শক্তি বা তেজঃ সদাসর্ব্বদা আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া নিয়ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, এবং অজ্ঞাতসারে অন্যের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্যকে সেইরূপে পরিণত করিতে পারে বা করিয়া থাকে। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে নীচ লোকের সংস্রবে থাকা, নীচ ব্যক্তির স্পর্শিত অন্নাদি আহারে নিষেধ আছে। মোটামুটি এই প্রবৃত্তিকে বা বুদ্ধিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম সত্বগুণ। ২য়। রজঃগুণ ৩য়। তমঃগুণ। ভগবান বলিয়াছেন—এই গুণানুসারে আমি মানবগণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি।—

চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ॥

আমি গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা চারি প্রকার বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

আবার ইহার মধ্যে বুদ্ধি বিকৃতিজনিত নানাপ্রকার হইয়া পড়িয়াছে।

এই এনিমেল্‌-তেজঃ মানবের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বাহির হইলেও ওষ্ঠ ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া থাকে। আবার অভ্যাস করিলে বেশী বেশী বাহির করা যায়। কথা কহিবার কালে বা চর্ব্বণ কালে

ঠোঁট দিয়া প্রচুর পরিমানে ইহা বাহির হইতে থাকে; এই জন্যই যোগশাস্ত্রে মৌনী হইবার ব্যবস্থা আছে। মস্তকে ও দাড়িতে চুল থাকিলে মস্তক ও মুখমণ্ডল হইতে অল্প বাহির হইতে থাকে। কারণ চুল যে অপরিচালক তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। যে পদার্থের উত্তাপ পরিচালনের শক্তি নাই, তাহাদের **অপরিচালক** কহে। অপরিচালক দ্রব্যের মধ্যে কাঁচ, অভ্র ও চুল শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। তাই সকলেই দেখিয়াছেন ইলেকট্রিক্ তার বাঁধিতে বা বৈদ্যুতিক ব্যাটারিতে কাজ করিবার সময় কাঁচের উপর বসিয়া করিয়া থাকে। ট্রাম-চালিত তারে কাজ করিতে কাঁচের উপর দাঁড়াইয়া করিতে হয়; অন্যথায় মৃত্যু হইয়া যায়।

যে সকল দ্রব্য উত্তাপ চালিত করিতে পারে, তাহাদের **পরিচালক** কহে। যেমন লৌহ, তাম্র ইত্যাদি, এইজন্যই ঐ সকল দ্রব্যে তার প্রস্তুত করিয়া টেলিগ্রামের তার হয়। চর্ব্বণ কালে আমাদের শরীরস্থ তেজঃ ঠোঁট দিয়া প্রচুর বাহির হয় বলিয়া আহারকালিন কথা কহার নিষেধ আছে।

স্কুলের শিক্ষকগণকে বালকদের উপদেশ দিবার জন্য অনেকক্ষণ কথা কহিতে হয়; সুতরাং এনিমেল্-ম্যাগ্নেটিক্ স্রোত প্রচুর পরিমাণে ঠোঁট দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায়

শিক্ষকদের শরীর খারাপ হয়, এই কারণে অল্প বয়সে শিক্ষকদের মৃত্যু সংখ্যা বেশী।

ঐ তেজঃ ইচ্ছাশক্তির সহিত নিকটস্থ ব্যক্তির শরীর মধ্যে চালিত করিয়া তাহাকে নিজ অধীনে আনিয়া কাজ করান যায়। ইহাকে **হিপ্‌নোটাইজ্‌** করা কহে। হিপ্‌নোটাইজ্‌ করিয়া ক্রিয়াপাত্রকে যাহা ইচ্ছা করাইতে পারা যায়। আজকাল অনেক স্থলেই হিপ্‌নোটাইজ্‌ করিয়া অনেক কাজ করা হইতেছে। আবার ঐ ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা দূরস্থ ব্যক্তিকেও কাজ করান যায়। তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

অনেক দিনের কথা, কলিকাতা নিবাসী জনৈক যুবক, বি, এল্‌ পাশ হইয়া ওকালতী করিবার মানসে বিদেশে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার নয় বৎসরের বালিকা স্ত্রীর মুখে শুনিলেন—**আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না,** একথায় তিনি' কর্ণপাতও করিলেন না, চলিয়া গেলেন। যথাস্থানে পৌছিয়াই তাঁহার জ্বরও নিউমোনিয়া হইল, কয়েকদিন পরে ভাল হইলে সকলে কহিল—উকিল বাবু! আপনার একখানি টেলিগ্রাফ কয়েকদিন হইল আসিয়াছে, আপনি পীড়িতাবস্থায় ছিলেন, তাই দেওয়া হয় নাই। তিনি টেলিগ্রাফ পড়িয়া দেখিলেন,

তাঁহার স্ত্রী কঠিন পীড়ায় পীড়িত। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতা যাত্রা করিলেন, বাড়ী পৌঁছিয়া শুনিলেন, তাঁহার সেই বালিকা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। বালিকাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, বিশেষতঃ যাত্রা কালিন যে "আমার সহিত আর দেখা হইবে না" শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ যাতনা দিতে লাগিল। ইহার কোন কিছু কারণ আছে কি না জানিবার জন্য ভাট পাড়ার টোলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় টোল হইতে কোন বিশেষ সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া, তিনি ঐ বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া কাশী যাইলেন, কিন্তু কাশীতে কে কোথায় আছেন যে, ইহার প্রকৃত উত্তর পাইবেন অজ্ঞাত থাকায় যথাতথা ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। একদিন প্রাতেঃ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাঁড়াইয়া আছেন, কতলোক ঘাটে নামিতেছে, স্নান করিতেছে, পূজা আহ্নিক করিতেছে, চলিয়া যাইতেছে। তিনি শূন্য হৃদয়ে দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছেন, কিন্তু কিছুই দেখিতেছেন না, সবই শুনিতেছেন, কিন্তু কিছুই শুনিতেছেন না, নিজ চিন্তায় বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার প্রতি কে তাকাইবে? কে তাঁহার মনবেদনা বুঝিবে? ধীর, গম্ভীর

ভাবে দাঁড়াইয়া স্থির নেত্রে সবই দেখিতেছেন, অথচ কিছুই দেখিতেছেন না। হায় হায় এই যুবার হৃদয়ের শেল কে দেখিবে, কে বুঝিবে, মা বাপও যখন দেখেন নাই, তখন আর কে দেখিবে? কেহই হতভাগ্যকে দেখিল না; তাঁহার হৃদয়ের ভার কেহ একটুকুও লইল না। মণিকর্ণিকার ঘাটে কত মৃতদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, যুবারও মন মনাগুণে পুড়িতেছে, কিন্তু ছাই তো হলো না। হৃদয় পুড়ে যাচ্চে, কিন্তু কই ছাই তো হলো না। যুবার চক্ষে জল নাই। মনাগুণে পুড়িতেছে, কাজেই জল আর কোথা থাকিবে,আগুণের উত্তাপে জল শুখাইয়া গিয়াছে।সে যে কি যাতনা, যাহার সেই বুঝিতেছে, সে বিষের জ্বালা কে বুঝিবে? কিন্তু গুরুর দয়া অক্ষুণ্ণ,তিনি দয়াময়, দয়ার সাগর। যুবার হৃদয়ের বেদনা, তিনিই বুঝিলেন—যুবক স্পষ্টাক্ষরে শুনিল—একব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলিল, **"কাশীতে কেন লক্ষ্ণৌ যাও"** যাহাকে তিনি বলিলেন তিনি শুনিলেন না, উভয়েই চলিয়া গেলেন কথাটা বজ্রসম যুবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। কে কাহাকে বলিল? কই আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও তো বলেন নাই; তবে কাহাকে তিনি বলিলেন—যাকে বলিলেন—তিনিও তো কই শুনিলেন না, তবে কি আমাকে বলিলেন; তাই বা কি করিয়া

বুঝি। এইরূপ অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর লক্ষ্মৌ যাওয়াই স্থির করিয়া সেই দিনই রাত্রির ট্রেণে লক্ষ্মৌ চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানেই বা কে কোথায়? তখন যুবক দিশাহারা হইয়া নাবিকহীন সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জাহাজের ন্যায় গন্তব্য নির্ণয়হীন হইয়া যথাতথা পাগলের মত বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কর্ণধার কর্ণধারের কাজ করিতেছেন। একদিন লক্ষ্মৌ ঘাসিয়ারি মুণ্ডীর মোড় ফিরিতেছেন, দারুণ রৌদ্র, রাস্তায় জনপ্রাণী নাই। **"লক্ষ্মৌ নয় ভিলেজে যাও"** অতিতীব্র আদেশ শুনিলেন। কে কাহাকে কোথা হইতে বলিল? যুবক ভাবিয়া আকুল হইলেন; উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া দৌড়া দৌড়ি করিতে লাগিলেনএবং **কে এই কথা বলিলেন, দয়া করিয়া একবার আমায় দেখা দিউন,** বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িলেন। সমস্ত চেষ্টা বৃথা হইল। কেহই কোথাও নাই। স্তম্ভিত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুণের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যদেচ্ছা চলিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি কাহারও আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন। দ্রুতপদে, ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই জানেন না; যেন কাহারও অলঙ্ঘনীয়

আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। ভয়ের লেশ মাত্র নাই, মনের উদ্বেগে, দ্বিগুণ উৎসাহে, অনাহারে চলিয়াছেন, ক্ষুৎ পিপাসার জ্ঞান নাই, কোন ইচ্ছা নাই, কোথায় যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন, কিছুরই জ্ঞান নাই, কিছুই দেখিতেছেন না, কিছুই শুনিতেছেন না; কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করিতেছেন না; আপন মনে ভীমবেগে চলিয়াছেন। যখন সন্ধ্যা হইল; তখন চৈতন্য হইল **কোথায় যাইতেছি**; পথশ্রান্তি ও ক্ষুৎপিপাসার জ্ঞান হইল, আশ্রয় পাইবার জন্য লোকালয় পাইবার চেষ্টা আসিল। দেখিলেন—সম্মুখে একটী কুটীর "**একটী বৃদ্ধ**" বসিয়া আছেন। বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার রূপের ছটায় দিক আলো করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া যেন তাহার মোহ কাটিয়া গেল,যেন কত পরিচিত, যেন কত আত্মীয়, যেন কতই হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে হইল। মনে বেশ একটু সাহস হইল। ভক্তি ভরে হৃদয় খানি গলিয়া গেল। কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ স্বরে কহিলেন—**প্রভু-আমি নিরাশ্রয়, আমি বিপন্ন, ক্লান্ত, পথশ্রান্ত, দয়া করিয়া একটু স্থান দিউন, কিছু চাহি না, কিছু খাইব না, কেবল শুইয়া থাকিব**"।

বৃদ্ধ সহাস্য বদনে মধুর বাক্যে বলিলেন—"এসো বাবা এসো, এসো বেটা এসো; বড়ই কষ্ট হয়েছে" এই কথাগুলি যুবকের কাণে অমৃত বর্ষণ করিল, এমন হৃদয়গ্রাহী, এমন আত্মীয়তাপূর্ণ, এমন স্নেহময়, এমন মধুমাখা কথা তিনি যেন কখন শোনেন নাই। বাপ মাকে মনে পড়িল, তাঁহারা কোথায়, আর আমি কোথায়, ভাবিয়া মনে মনে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ভক্তিভরে অদৃশ্যে বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলেন—আপনি কে?

বৃদ্ধ যেন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই একটু হাঁসিয়া বলিলেন—ঐ ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া হাত, পা, মুখ ধুইয়া এসো। যুবক তাহাই করিল। তখন বৃদ্ধ একটী বালককে কহিলেন একটু গুড় ও এক লোটা জল আনিয়া দাও। যুবককে খাইতে আদেশ দিলেন। যুবক জল খাইয়া বসিলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোথায় যাইতেছ?

যুবক।— দেশ ভ্রমণে।

বৃদ্ধ।—আমার নিকট গোপন করিও না, সব কথা বলিতেই হইবে।

যুবক।—গোপন করি নাই, প্রকৃতই দেশ দেখিয়া বেড়ানই উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধ।—কেন মিথ্যা কথা কহিতেছ, বাবা। আমার নিকট তোমার কিছুই গোপন নাই। নয় বৎসরের বালিকা বলিয়াছিল" "আমার সহিত আর দেখা হইবে না" এই তো তোমার দেশ ভ্রমণের মূল। মণি-কর্ণিকার ঘাটে আমিই তোমাকে "লক্ষ্ণৌ আসিবার জন্য আদেশ দিই"।

লক্ষ্ণৌ ঘাসিয়ারি মুণ্ডির মোড়ে আমিই তোমাকে "ভিলেজে যাও" বলিয়াছিলাম। বালিকার নিজের কিছুই ছিল না, তাহার পিতা মাতার ক্ষমতায় সে জানিতে পারিয়াছিল, সে আর বেশী দিন বাঁচিবে না। তাহার মৃত্যু দিন তাহার জানা ছিল বলিয়াই, সে বলিয়াছিল—আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ইহা কিছুই অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য জনক নহে। কাল তোমার দীক্ষার দিন। আজ আর কিছু খাইতে পাইবে না। কাল প্রাতেঃ তোমাকে দীক্ষা দিব। পরে কাশীতে তোমার গুরুভাইয়ের কাছে কিছু শিক্ষা করিতে হইবে। পরে বাড়ি যাইয়া সংসারী হইবে। যুবক স্তম্ভিত, কাষ্ঠবৎ, আনন্দে ও

নানা চিন্তায় রাত্রিতে আর ঘুম হইল না। প্রাতেঃ দীক্ষিত হইলেন।

এই যে অন্তের মুখ দিয়া গুরুর আদেশ হয়, ইহাও মানুষে করিতে পারে। এই আদেশকে **আদেশাজ্ঞ** কহে সুতরাং দূর দুরান্তর হইতে ইচ্ছা শক্তি চালিত করিয়া অন্তের দ্বারা কাজ করান যায়।

এইরূপে ইচ্ছাশক্তি চালনা করিয়া নিকটস্থ রোগী ভাল করা তো সহজ। দূর দুরান্তর হইতেও রোগ অনেকে আরোগ্য করিতে পারেন, ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

ঢাকার কোন ভদ্রলোকের দুইটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। একটীর বয়স ৮ বৎসর আর একটী ৫ বৎসরের; দুইটীই ঠিক একই প্রকারের দেখিতে। ইহারা সহোদরা। হঠাৎ বড় মেয়েটী শৃগালে কামড়াইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। শৃগাল অন্য কেহই দেখিতে পাইত না। ছোট মেয়েটী শৃগাল দেখিতে পাইত। বড় মেয়েটীকে কামড়াইত।

সকলেই শৃগালের কামড়ের দাগ এবং রক্তপাত দেখিতে পাইত। তৎকালে ঢাকাতে একজন মহাত্মা হোমিওপ্যাথ ছিলেন। তিনি সেই দুইটী রোগিনীকে হাতে লইয়া

শক্তি চালনা দ্বারা অনেক উপকার করিয়াছিলেন। রোগের আক্রমণকাল বিলম্বে বিলম্বে হইতে লাগিল। বালিকারা উভয়েই শৃগাল দেখে মাত্র, কামড়ায় না। কোন দিন বা কামড়ায়। আবার কোন দিন কামড়ায় রক্তপাত হয় না। এইরূপ হইতে লাগিল। এমন সময় তাহাদের পিতা ও মাতা কার্য্যগতিকে কাশী যাইলেন; তাহাদেরও লইয়া গেলেন, যদিও তাহারা ভাল হয় নাই, কিন্তু যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল এবং ডাক্তার বাবুর নিতান্ত আয়ত্তাধীনে আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ঠিক সেই সময়ে তাহারা দুই ভগনি একটী নির্জ্জন ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। ঐ সময় ঢাকা হইতে ডাক্তার বাবু তাহাদের শরীরে ইচ্ছাশক্তি চালিত করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। কাশীতে যাইয়াও দু এক দিন দংশিত হইয়াছিল, ছোট মেয়েটী প্রত্যহ শৃগাল দেখিতে পাইত কিন্তু একদিনও দংশিত হয় নাই। বড় মেয়েটীকেই কামড়াইত। যখন বড় মেয়েটীকে কামড়ান বন্ধ হইল অথচ দেখিতে পাইত, তখন ছোট মেয়েটী ভাল হইয়াছে অর্থাৎ সে তখন আর শৃগাল দেখিতে পায় না। এরূপ রোগ বড় একটা দেখা বা শুনা যায় না, এবং অনেক চিকিৎসকই এই নিজ শক্তি রোগীর

শরীরে পরিচালিত করিয়া আরোগ্য করিতে জানেন না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে এ কার্য্য আপনাপনি সাধিত হইয়া থাকে। তাই বলি গৃহস্থের অসদ্ব্যবহারে চিকিৎসক যেন রোগীর উপর অসন্তুষ্ট না হন। অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইলে **রোগীর আরোগ্যের পথ সঙ্কীর্ণ** হইয়া আসিবে। কারণ যখন অজ্ঞাতসারে সেই ডাক্তারের ম্যাগ্‌নেটীক্‌-শক্তি রোগীর শরীরে চালিত হয়। তখন চিকিৎসক রোগীর উপর সদয়, স্নেহময়,মঙ্গল প্রার্থী থাকিলে সেই শক্তির স্রোতে রোগীর রোগ-আরোগ্য-কারিণী-শক্তি সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিতে থাকে। শরীরের কোন প্রকার বিকৃত ভাব আনয়ন করে না। কাজেই ঔষধও সুনিয়মে নিজ কার্য্যদ্বারা জীবনীশক্তির বল বৃদ্ধি করিতে পারে।

ঔষধ সকল স্নায়ুমণ্ডলদ্বারা রোগের স্থানে নীত হইয়া রোগ আরোগ্য-উৎযোগী-জীবনীশক্তি বা রোগ আরোগ্য কারিণী-শক্তির উপর নিজ নিজ কার্য্য প্রকাশ করে। সেই স্নায়ুমণ্ডল যদি সুনিয়মে আপন মতে কার্য্য করিতে পায়, তবেই ঔষধও সহজেই তাহার সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু যদি চিকিৎসক রোগীর উপর বিরক্ত, ত্যক্ত, দ্বেষী, অমঙ্গল প্রার্থী হন; তবে তাঁহার শরীরস্থ ম্যাগ্‌নেটিক্‌ স্রোত যাহা তাঁহার অজ্ঞাতসারে রোগীর উপর পড়িতেছে;

তাহাতে রোগীর স্নায়ুমণ্ডল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, কাজেই সেই বিশৃঙ্খল স্নায়ুমণ্ডলে পড়িয়া ঔষধও বিশৃঙ্খল কার্য্য করিবে। কাজেই রোগীর আরোগ্যের পথ খাটো হইয়া যাইবে, শঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। চিকিৎসক রোগীর উপর যতই অসন্তুষ্ট, বিরক্ত হইবেন, রোগী ততই অস্থির, উৎকণ্ঠিত, বিরক্ত হইতে থাকিবে। চিকিৎসকের যতই রোগীর উপর ক্রোধ হইতে থাকিবে, রোগীও ততই খিট্‌খিটে ও রাগী হইবে; তাহার স্নায়ুমণ্ডলের বিশৃঙ্খলতাই রোগীর এই অস্থিরতা, ক্রোধী ও খিট্‌খিটে হইবার কারণ। চিকিৎসক যতই রোগীকে ভালবাসিবেন, যতই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন; রোগী ততই ধীর, স্থির, শান্ত হইবে। রোগী যতই স্থির, ধীর, সন্তুষ্ট হইবে, স্নায়ুমণ্ডল ততই শান্ত ভাব ধারণ করিবে, স্নায়ুমণ্ডল যতই শান্ত ভাবান্বিত হইবে; ততই ঔষধ সকল নিজ নিজ কার্য্য করণে সক্ষম হইবে। রোগী সর্ব্বদা রাগ করিলে তাহাকে আরোগ্য করা কঠিন হয়। এইজন্য হানিম্যান বলিয়াছেন, "**ক্রনিক রোগাক্রান্ত রোগী যদি না রাগিয়া থাকিতে না পারে; তবে তাহাকে ভাল করিতে পারিবে না**।" কারণ রাগ হইলে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত, উগ্র হইয়া উঠে।

স্নায়ুমণ্ডল উগ্রভাব ধারণ করিলে ঔষধ সকল তাহার উপর কার্য্য করিবার অবসর পায় না। সেস্থলে সুনির্ব্বাচিত ঔষধও ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় হইয়া পড়ে। তাই বলি ভাই, নির্ব্বোধ, স্বার্থপর গৃহস্থের অযথা অপমানে কুণ্ঠিত হইয়া রোগীর অনিষ্ট করিও না। তাহা হইলে তোমাতে আর গৃহস্থে কি প্রভেদ হইল? চিকিৎসক জীবন দাতা পিতা ও মহৎ। গৃহস্থের মত বোকা স্বার্থপর হইলে আপনার মহত্ত্ব কোথা থাকে? আপনি মহৎ, আপনি জগৎ পূজ্য, জীবনদাতা, রক্ষাকর্ত্তা, গুরু ও গরীয়ান। অটল, অচল ভাবে স্থির থাকিয়া জগতের মঙ্গলময় মনুষ্য জীবন, রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও স্থির সংকল্পাশ্রিত হউন। সকলের পূজা গ্রহণ করুন। জগদীশ্বরের কার্য্যের সহায়তা করিয়া তাঁহার প্রেয় পাত্র হউন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

এই শক্তি চালিত করিতে শিক্ষা করুন, অভ্যাস করুন। নিজ শক্তি দানে মৃত্যুন্মুখ ব্যক্তির জীবন দান করিয়া তাহার ও নিজের মঙ্গল সাধন করুন। এই জীবনী শক্তি দানে মৃত্যুন্মুখ ব্যক্তির রক্ষা বিষয়ে একটী প্রকৃত ঘটনা বলিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহাবিদ্যা হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত।

একজন ডাক্তার কর্ত্তৃক বর্ণিত।

আমার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভূত ঘটনা মনে করিয়া এতাবৎ গোপনে রাখিয়াছিলাম। যাঁহাকে লইয়া এই গল্প, তাহাকে জীবনে আমি তিনবার মাত্র দেখিয়াছি। তাঁহার নাম অনন্তরাম। অনন্তরাম মোটের উপর সুন্দর পুরুষ ছিলেন। এক সময়ে ইহাঁর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে পড়িতাম। এমন ভাবব্যঞ্জক চক্ষু কাহারও দেখি নাই। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়াই বেশী সময় থাকিতেন। আমরা সকলেই অনন্তরামকে অসাধারণ বুদ্ধিমান বলিয়া মানিতাম। সাধারণ ডাক্তার যাহারা সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে অনন্তরাম, সবজান্তা বলিয়া ঠাট্টা করিতেন।

তিনি মস্তিষ্কের আলোচনাতেই সদাই অনুরক্ত থাকিতেন। সকলে তাঁহাকে পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, মনে করিতেন, কিন্তু ঠিক পরীক্ষার

অব্যবহিত পূর্ব্বেই অনন্তরাম সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন; কেহই জানিতে পারিল না। আমি পরীক্ষায় পাশ হইলাম। পরে মিরাটে চাকরি লইয়া যাইবার সময় পথে এলাহাবাদে দিন কতক থাকিতে হইল। একদিন নিষ্কর্ম্মাভাবে পথে বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ সাম্‌না সাম্‌নি অনন্তরামের সঙ্গে দেখা। আমি তাঁহার নাম করিয়া ডাকিলাম, ডাক শুনিয়াই অতি আনন্দের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কি জন্য এলাহাবাদে, পরে তাঁহার বাসায় যাইবার অনুরোধে, তাঁহার বাসায় যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম। হঠাৎ নিরুদ্দেশের কারণ কি?

উত্তর।—কারণ ছিল, ওরকম ভাবে দিন কাটান ভাল লাগিল না। খাটুনি আর খাটুনি, কেবল খাটুনি। যতই পড়ি; দেখি পড়িয়া কোন জ্ঞানই হয় না।

আমি তাঁর বাসায় গিয়া যা দেখিলাম, তাহাতে অবাক্ হইলাম।

তাহার বাসা বাড়ি সহরের বাহিরে। বাড়ি নয়, একটী প্রাসাদ বলিলেও বলা যায়। একটী যেন রাজ বাড়ি। অন্যান্য বিষয়ও খাদ্যাদি রাজ বাড়ির মত।

তিনি আমাকে এঘর ওঘর করিয়া সব দেখাইয়া শেষে যে ঘরে লইয়া গেলেন সে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা শোভা ও সজ্জার

প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। দেখিলাম সেই ঘরের জানালার কাছে একটী **পরমাসুন্দরী যুবতী** বসিয়া আছেন। যেন দেবীমূর্ত্তি, এমন রূপ তো কথন দেখি নাই।

অনন্তরাম হাঁসিয়া বলিলেন—**স্মিরণা,** ইনি আমার বাল্য বন্ধু, বাঙ্গালী।

অনন্তরাম আমাকে বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন। তখন আমি বলিলাম, উনি আপনার স্ত্রী বোধ হয়?

উত্তর করিলেন—ইনি আমার প্রাণ, আমার জীবন, আমার সর্ব্বস্বধন, কিন্তু আপনারা যাহাকে স্ত্রী বলেন, সেরূপ স্ত্রী নহে।

আমি এলাহাবাদ হইতে চলিয়া আসিবার সময় তিনি ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, অনেক কথা হইয়াছিল।

আমি মিরাটে আসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, পরে শরীর খারাপ হওয়ায় ছুটী লইয়া বাড়ি আসিবার সময় এলাহাবাদে অনন্ত রামের খোঁজ লইয়া জানিলাম, সমস্ত বিক্রয় করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহ জানে না।

দুবৎসর পরে একটিনি লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গেলাম।

একদিন বৈকালে একজন হিন্দুস্থানী আমাকে বলিলেন —কালিবাড়িতে একজন ভদ্র লোক আসিয়া দুদিন ছিলেন। আজ তিনি মুমূর্ষু অবস্থায়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে

দেখ্‌লে ভাল হয়। আমি কালি বাড়িতে গেলাম। পূজারী ব্রাহ্মণ আমাকে সঙ্গে করিয়া রোগীর ঘরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, যেরূপ অবস্থা রক্ষা পান বলিয়া মনে হয় না।

ঘরের ভিতর যাইয়া যাহা দেখিলাম—স্তম্ভিত হইলাম। **অনন্ত রাম ছেঁড়া চটের উপর দীন-ভাবে মৃত্যু শয্যায় শায়িত।** অনেক বার ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না, তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার সর্ব্ব শরীর **শিহরিয়া** উঠিল।

তিনি আমাকে বেশ চিনিতে পারিলেন। বেশ জ্ঞান আছে। বলিলাম—অনন্তবাবু ভাই একি ?

যখন এই কথা বলি, তখন আমার মনে হইল,এলাহাবাদে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইবে। অনেকবার ডাকিলাম, অনেক প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু **বাক রোধ**, কথা কহিবার শক্তি নাই।

অনেক পরীক্ষা করিয়াও কি রোগ হইয়াছে, ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমি তাঁহাকে একখানা খাটিয়াতে তুলিয়া কাহারের

দ্বারা আমার বাসায় আনিয়া জনৈক হিন্দুস্থানীকে সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়াদিলাম।

কালীবাড়ী হইতে অনন্তরামের কাপড়াদি আনিয়াছিলাম। তাঁহার ঠিকানা পাইবার আশায় কাপড়গুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। তাঁহার কোন আত্মীয়ের নাম বা ঠিকানা পাইলাম না। এক টুকুরা চিঠী যাহা পাইলাম, তাহা স্ত্রীলোকের লেখা। তাহাতে লেখা ছিল "তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াই যাও, আর যেখানেই লুকাইয়া থাকো, ঠিক জেনো সেই সময় উপস্থিত হলে, আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই করিব। সেই কাল পর্য্যন্ত দাসী তোমার চরণে বিদায় মাগিয়া লইতেছে।" অনন্তরাম যেন মরিবার জন্যই এখানে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ব্যাপার কিছুই যেন বুঝা যায় না; যে বলিবে, সে তো বাক্‌রোধ অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

তাঁহার সেবার জন্য যে লোক নিযুক্ত করিয়া ছিলাম, সে আর কিছুতেই থাকিতে চাহিল না। বলিল, বাবা যে চাহনি! আর থাক্‌বো না। অনেক চেষ্টাতেও

লোকটাকে কোন মতেই রাখিতে পারিলাম না। তখন নিজে একখানি ইজিচেয়ার লইয়া অনন্তরামের কাছে গিয়া বসিলাম। আস্তে আস্তে আমার নিদ্রা আসিতে লাগিল; তারপর এলোমেলো স্বপ্ন দেখ্‌তে বাগ্‌লাম। যেন আমি কাহারও বশীভূত হইয়া পড়িতেছি; মনে হইতে লাগিল। এমন সময় আমার যে ঘুম আসিতেছিল যেন ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম অনন্তরামের উজ্জ্বল চক্ষু দুটী আমার উপর নিক্ষিপ্ত।

তার পরই আমার ইচ্ছাশক্তি ও গতি-শক্তি লোপ হইয়া গেল, চক্ষুর পলক্ ফেলিবারও ক্ষমতা আমার আর রহিল না; তার একটু পরেই চিন্তাশক্তি কিছু মাত্র রহিল না। সব অন্ধকারময়, যেন কোয়াসাবৃত বোধ হইল, কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে অনন্ত-রামের উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বল চক্ষু দুটী আমার সম্মুখে রহিল, আর আমার ইচ্ছাশক্তি কিছু মাত্র রহিল না।

পরক্ষণেই আমার মনে হইল, আমি পীড়িত হইয়া

বিদেশে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছি। কোন স্ত্রীলোককে যেন প্রাণের অধিক ভালবাসি। সে অনেক দূরে। তবে আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আমার কাছে আসিতে পারে। তাকে চিটি লেখ্‌বার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল; আবার মনে মনে ধিক্কার হইতে লাগিল; যদি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আমার কাছে আসিতে পারে; তবে তাহার একটা **ভয়ানক দুর্ঘটনা** ঘটিবে। তার পর আমি অজ্ঞান হইয়া রহিলাম। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখি, আমি ডাক-ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া আছি। যেন একখানি **চিটি ডাকবাক্সে** ফেলিয়াছি, মনে হইতে লাগিল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। পরে বাসায় আসিয়া একখানি খাটিয়ার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, "**কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার**।"

আমি অনন্তরামের **অদ্ভুত মানসিক শক্তির চালনায় এইরূপ অভিভূত** হইয়াছিলাম। ভাবিলাম ইহাই কি **মেস্‌মেরিজম নাকি**?

এ তো বড় প্রলয়ঙ্করী।

এইরূপে দশদিন কাটিয়া গেল, অনেক চেষ্টাতেও

রোগের কোনই উপকার করিতে পারিলাম না। ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক ছিল, কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কতদিন চলিয়া গেল, অনন্তরাম সেই নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া আছেন।

যখন ঘরের দরজা খোলা হয়, তখনই দেখি অনন্তরাম ভীত ভাবে উৎকণ্ঠার সহিত দরজার দিকে তাকাইয়া আছেন। আমাকে বা চাকরকে দেখিলে আশ্বস্ত হন। তাঁহার যদি আমাকে দিয়া পত্র লেখাইয়া স্ত্রী আনানই মত, তবে তো তাঁহার ভরসাযুক্ত দৃষ্টি হওয়াই উচিত ছিল! কাতরভাব কেন? ভয়ের ভাব কেন? বুঝিতে পারি না।

তার পরও অনন্তরাম আমাকে নিজ বশে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা পারিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছি; যেন বশীভূত হই হই, এমন সময় চাকরটা আসিয়া আমার মোহ ভাঙ্গিয়া দিল। আর একদিন যেন মনে হইতে লাগিল, বেশী পরিমাণে লডেনম্ (আফিংয়ের আরক) খাওয়াইয়া দিই। তখনি সাবধান হইলাম। বুঝিলাম, অনন্তরাম আমার দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে। কেন যে আত্ম-হত্যার চেষ্টা তা তো বুঝি না। মৃত্যু যন্ত্রণায় লোকে

মরিতে চাহে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তাঁহার কাছে নিজে একা তো যাইতাম না; আর কাহাকেও যাইতে দিতাম না।

ভয় হইত অনন্তরাম যাহাকেই একা পাইলে তাহারই দ্বারা আত্ম-হত্যার চেষ্টা করিবে।

হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। ক্রমে অনন্তরামের আর সময় নাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে স্থির করিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত অনন্তরামের কাছে থাকিলাম। শেষ রাত্রিতে নিজের ঘরে আসিয়া শুইলাম। উঠিতে সেদিন বেলা হইয়াছে। চাকরটী কপাটে ধাক্কা দিয়া ডাকিল। উঠিয়া দেখি, তাহার পশ্চাতে একটী স্ত্রীলোক। সে সেই অনন্ত রামের—**মিরণ**।

মিরণ আমার দিকে তাকাইলেন, তখন তাহার ঠোঁট ছুটী কাঁপিতেছিল।

বলিলেন—এই বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক মরণাপন্ন অবস্থায় আছে কি?

আমি বলিলাম হাঁ—**অনন্তরাম**। বলিলেন আমি কি সময় মত পৌছিয়াছি? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন?

অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু এখনও বাঁচিয়া আছেন। ইহা শুনিবা মাত্র তাঁহার মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ হইল। হায়রে কেন এ আনন্দ? এখনই সব নিবিয়া যাইবে। তবে কিসের এ আনন্দ? কিছুই তো বুঝিলাম না।

তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতাকে ডাকিলেন। চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। বলিলেন "আমাকে লইয়া চলুন"। আমি বলিলাম আপনি একটু বিশ্রাম করুন এবং একটু জল খান; তিনি অস্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিব না। তাঁহার পত্র পাইয়া দিবারাত্র অবিশ্রামে আসিয়াছি। দেরী করিবেন না। দেরি হলে হয় তো সব পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে।

তিনি দুয়ার ঠেলিয়া আমার আগেই অনন্তরামের কাছে গেলেন। অনন্তরামের দৃষ্টি দুয়ারের দিকেই ছিল। মিরণকে দেখিয়া কোথায় তাঁহার আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ হবে; না তৎ পরিবর্ত্তে বিস্ময় ক্লেশের চিহ্ন, দারুণ মর্ম্মাহতের চিহ্ন মুখে প্রকাশ হইতে লাগিল। মুখের চেহারা বিকৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, এইবার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়।

মিরণকে দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব এমন হইবার কারণ কি? তিনি কি ইহার সহিত অসদ্ব্যবহাব করিয়াছেন যে, তাঁহার মনে ভয়ের উদয় হইবে? এই আসন্ন কালে মিরণ কি তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে আসিয়াছেন? যদি তাই হয়, তবে কেন তিনি আমাকে বশীভূত, মোহগ্রস্থ করিয়া আমার দ্বারা পত্র লেখাইয়া বহু দূর হইতে তাঁহাকে আনাইলেন? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মিরণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করুন, আর নাই করুন, মিরণ কিন্তু তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে আসেন নাই। ইহা অল্পক্ষণ মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। মিরণ শোকোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইয়া **অনন্তরামের শীর্ণ পদযুগল বক্ষঃস্থলে লইয়া তদুপরি মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে** পদদ্বয় প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

তিনি কি ভাষায় কি কহিতে "লাগিলেন, তাহা কখন শুনি নাই এবং তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। তবে শেষ অবস্থায় যে প্রাণেশ্বরের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার **পরম আনন্দ**। মাত্র ইহাই বুঝিলাম।

এই সময়ে অনন্তরামের মুখমণ্ডলে নিগূঢ় প্রেম-

ময় ও শান্তিময় ভাবের আভাস দেখা গেল। কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্য। পরক্ষণেই চক্ষু কঠোর ভাব ধারণ করিল। আমার বেশ বোধ হইতে লাগিল, যেন মিরণকে দূর হইতে বলিতেছেন। কিন্তু সে হুকুম মিরণ একেবারেই গ্রাহ্য করিল না। তখন আবার অনন্তরামের মুখে অনুনয় বিনয়ের ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, কিন্তু মিরণ কিছুতেই ছাড়িল না। মিরণ পদযুগল বক্ষঃস্থলে ধরিয়া বারম্বার তদুপরি শিরোলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। শেষে অনন্ত-রাম যেন ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া চক্ষু বুঝিলেন, ভাবিলাম এই বুঝি শেষ।

নিকটে গিয়া দেখি, মৃত্যু হয় নাই; শ্বাস বহি-তেছে, কিন্তু আর দেরী নাই, ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক ঘণ্টা। মৃত্যু নিশ্চয়। তখন মিরণকে বলিলাম—আপনি ক্ষান্ত হউন; মনের উদ্বেগে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে।

এই কথা শুনিবা মাত্র তিনি পদদলিত সর্পিণীর ন্যায় উন্নত হইয়া আমার প্রতি এমন ভাবে তাকাইলেন; আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

তখন বিষম তেজের সহিত মিরণ বলিয়া উঠিলেন। আপনি এখান হইতে চলিয়া যান।

আমার স্বামীর নিকট আমি এক থাকিব।

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া চাকরটীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় একবার শেষ দেখা দেখিলাম—অনন্তরাম অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া আছেন, মিরণ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া সেই রক্তশূন্য মুখখানি নিজের সজীব বিম্বোষ্ঠের নিকট রাখিয়া বাহুলতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছেন, এই অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমার চক্ষে জল আসিল। এখনই এক টুকু পরেই এই প্রেম মুগ্ধ রমণীর কি দশা হইবে, ভাবিয়া মর্ম্মাহত হইতে লাগিলাম।

আমি আমার হস্পিটালে গেলাম এবং ভাবিলাম, আসিয়া আর হয়তো অনন্তরামকে দেখিতে পাইব না। তজ্জন্য হাঁসপাতালের কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া শীঘ্র আসিবার চেষ্টায় আছি ; এমন সময় এক দুর্ঘটনা। পাদরী সাহেব ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া, তাহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য মাজেষ্ট্রেট সাহেব পত্র লিখিয়াছেন। পাদরী সাহেবের কুঠি হাঁসপাতাল হইতে তিন মাইল। আমি ঘোড়ায় চলিয়া গেলাম। তাঁহার

কুঠিরের কাছাকাছি হইতেই হঠাৎ ঘোড়ার পা মচ্‌কাইয়া গেল। কাজেই পাদরী সাহেবের হাত বাঁধিয়া দিয়া আসিবার সময় পদব্রজেই আসিতে হইল।

আমার যতদূর সাধ্য দ্রুতপদে আসিতে আসিতে দেখি পথের পার্শ্বে একটা লোক পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

প্রথমে নজরেই আসে নাই। পরে নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলাম।

ভাবিলাম এটা কোন ছোট লোক মদ খাইয়া পড়িয়া, এমন করিতেছে. কিন্তু নিকটে আসিয়া দেখি, একটী ভদ্রলোক পথের পার্শ্বস্থিত ঝোপের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, এমন ভাবে কাঁদিতেছে; যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। নিতান্ত হতাশের ন্যায় এদিকে ওদিকে হাত ফেলিতেছে। মাটি কামড়াইতেছে। যেন অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতেছে ভাবিয়া, হেঁট হইয়া তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম;— বাবা তোমার কি হয়েছে?

আমি ছুঁইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া আমার আত্মাপুরুষ উঠিয়া গেল! **কি ভয়ঙ্কর!!! সে দৃশ্য এ জনমে ভুলিব না।** দেখিলাম **—অনন্তরাম সুস্থ শরীরে** আমার সম্মুখে

দাঁড়াইয়া! ছায়া নয়। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ সজীব ও সবল। দুই গাল দিয়া চক্ষের জল পড়িতেছে। দারুণ ক্লেশে দুই হাত রগড়াইতেছে।

কথা কহিব কি; আমার জিব তালুতে লাগিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গের লোম খাড়া হইয়া উঠিল, দুটো কথা একত্র করিবার ক্ষমতা রহিল না।

অনন্তরাম আমার কাছে আসিয়া আমার হাত জোরে ধরিয়া কহিলেন—**দেশে যাও, যদি আর তোমাকে দেখিতে পাই, তবে নিশ্চয় যেনো আমার হাতে তোমার মরণ!**

অনন্তরামের চেহারা ভাবভঙ্গি ও কথা শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। পিছন্‌ ফিরিয়া প্রাণের দায়ে দৌড়িলাম। যখন আমার জ্ঞান হইল, **দেখি বাসাতে পড়িয়া আছি।**

বাসাতে চাকর আদি জনপ্রাণী নাই। আমার বোধ হইতে লাগিল. আমি একটা কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। যাই হউক, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অনন্তরামের ঘরের দুয়ার খুলিলাম।

দেখিলাম বিছানার উপর সাদা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত একটী মানুষের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। মনে

করিলাম—অনন্তরামের মৃতদেহ। মিরণ ও বাসার সকলে আমার অনুপস্থিতিতে মৃতদেহ ফেলিয়া পলাইয়াছে। আমি যা স্বপ্ন বোলে মনে করিতেছিলাম, সে সব কথা আমার সমস্ত বেশ মনে ছিল। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া মনে মনে সাহস করিয়া লইয়া শেষে ঐ মৃত দেহের মুখের কাপড় খুলিলাম। দেখিয়াই **চীৎকার** করিয়া উঠিলাম।

দেখিলাম সেই **যুবতি মিরণ মৃতাবস্থায় পড়িয়া** আছে। তখনও **অধরে হাঁসির ছটা** লাগিয়া রহিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ নিজ ঘরে আসিয়া টাকাও দ্রব্যাদি যা ছিল লইয়া বাসা ফেলিয়া মাঠে মাঠে হাঁটিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া **হুগলির টিকিট** করিলাম।

পাঠক মহাশয়গণ এক্ষণে দেখুন ম্যাগ্‌নেটীক্-শক্তি দ্বারা কি না করা যায়। এই শক্তি সুশৃঙ্খলে চালিত করিতে অভ্যাস করুন। তাহার দ্বারা অমূল্য মনুষ্যজীবন রক্ষা করিয়া নিজ জীবন স্বার্থক করুন। নিজের স্বার্থবুদ্ধি একেবারে ত্যাগ করিয়া পরো-পকারে জীবন উৎসর্গ করুন। জগতে পূজনীয় হউন। জগদীশ্বরের দয়ার পাত্র হউন। কতক্ষণের জন্য পৃথিবীতে

আসিয়াছি, আর কতক্ষণ থাকিব। এই টুকুর মধ্যে যদি পরের কিছু উপকার করিয়া মরিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক হবে, তবেই মরণ সার্থক হবে, তবেই চিকিৎসা করিতে শিক্ষা সার্থক হবে। নতুবা গর্ভ যন্ত্রণা, পৃথিবীতে নরক যন্ত্রণা ভোগের পর, যম যন্ত্রণা মাত্র ভোগ, এই মাত্র লাভ হইবে।

এই জীবনীশক্তি চালিত করিয়া ইচ্ছাশক্তির দ্বারা রোগীর আরোগ্য কারিণী শক্তিকে বাড়াইয়া দিয়া, তদুপরি ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা রোগীর রোগের দারুণ যাতনার নিবৃত্তি করিয়া জীবন দান দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করুন। প্রকৃত পিতৃস্থানীয় হউন। অর্থ পিশাচ মনুষ্য হত্যাকারী হইয়া চিকিৎসক পদবাচ্য হইতে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করুন; অভ্যাস করুন। অভ্যাস করিলে কি না করা যায়? কি অভ্যাস দ্বারা মিরণ ও অনন্তরাম কি করিল! মিরণ কি অভ্যাস করিয়াছিল, কিরূপে নিজ জীবন দিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিল। অনন্ত-রামই বা কি খেলা খেলিয়া চির জীবনটাকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দিল। ম্যাগনেটীক্‌ শক্তি চালিত করিতে

এবং ঐ শক্তিকে নির্ম্মল করিতে অভ্যাস করুন। নিজ জীবনকে নির্ম্মল কোরে পরোপকারে নিয়োজিত করুন। ন্যায় পরায়ণ, দয়ালু ও বিনয়ী হইয়া আদর্শ চিকিৎসক হইতে যত্ন করুন। মরিলে আত্মীয় বন্ধু তো কাঁদিবেই,যদি শত্রু কাঁদাইয়া মরিতে পারি, তবেই তো মরণে সুখ হইবে। যে ব্যক্তি যত শত্রুতাই করুন না কেন, পুনঃ পুনঃ তাহার উপকার করিতে শিক্ষা ও অভ্যাস করুন। প্রাণদাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া যেন হত্যাকারী হইতে না হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।

ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে।

মিথ্যাচারী হইতে না হয়। রোগী দেখিতে গিয়া ব্যস্ত হইবেন না; তাঁড়াতাড়ি করিবেন না। যতক্ষণ ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচন না হইবে, ততক্ষণ ঔষধ দিবেন না। ঔষধ নির্ব্বাচনে নিজের মনে আনন্দ উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জানিবেন, ঔষধ ঠিক হয় নাই।

• ঔষধ ঠিক হইলে তাহাতে নিজ তেজঃ ও মাঙ্গলিক ইচ্ছাশক্তি যোগ করিয়া ঔষধ দিবেন। ঐ ইচ্ছাশক্তি

রোগীর শরীরে কেমন কোরে চালিত করিতে হয়, শিক্ষা করিয়া চালিত করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিকিৎকগণের মধ্যে অনেকের শক্তি চালনার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান নাই। এ বিষয় জানা প্রয়োজন বলিয়াও মনে করেন না। যদি কেহ বলে বা মনে হয়, তাহা হইলেও কলেজে ইহার বিষয় কখন কাহারও নিকট কর্ণগোচর না হওয়ায় বা আলোচনা না হওয়ায় নিস্প্রয়োজনীয় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অবহেলার বা অবজ্ঞার বিষয় নহে, এবং অতি প্রয়োজনীয় ও চিকিৎসার সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার দ্বারা যে রোগ আরোগ্য করা যায় কিম্বা ঔষধের ক্রিয়ার সফলতা বা তীব্রতা সম্পাদন করা যায়; ইহা অতীব মূল্যবান কথা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বা অনুমান অথবা সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, মেস্‌মেরিজম্‌ বা শক্তি চালনাদ্বারা

আরোগ্য হইলেও কখন কখন ইহার "ক্রিয়া স্থায়ী হয় না;" একথা সকল সময় সত্য না হইলেও এক কালিন মিথ্যা নহে।

যেমন সময় সময় ঔষধ দ্বারা আরোগ্যও স্থায়ী হয় না, তদ্রূপ মেস্‌মেরিজম্ দ্বারা আরোগ্যও স্থায়ী না হইতে পারে। তাহার অনেক কারণ আছে।

১। শক্তি-চালকের মনের একাগ্রতার তারতম্য।

২। শক্তি-চালকের বিশ্বাসের দৃঢ়তার ন্যূনাধিক্য।

৩। রোগীর রোগ প্রবণতার ইতর বিশেষ।

৪। রোগীর রোগ আরোগ্যকারিণী জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলতা।

৫। রোগীর রোগ উৎপত্তির কারণ বর্ত্তমান থাকা।

৬। রোগীর অত্যাচার, আহারের অনিয়মিতা।

৭। রোগীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব কিম্বা ব্যভিচার দোষ ইত্যাদি

কারণে ফল স্থায়ী হয় না। নতুবা স্থায়ী না হইবে কেন? ক্রিয়া সাধক ক্রিয়া পাত্রের নাম বদলাইয়া দিলে যখন সে সেই সাধক প্রদত্ত নামই দৃঢ় বিশ্বাসে মনে রাখিয়া, তাহাই বলিয়া পরিচয় দেয়, বা সেই নামে না ডাকিলে, তাহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিলে উত্তর দেয় না, তখন আরোগ্যতা স্থায়ী কেন না হইবে? তবে পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে স্থায়ী না হইতে পারে।

কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে সাবধানতায় অবশ্য আরোগ্য স্থায়ী হইবে। যাহারা মেস্‌মেরিক্‌ আরোগ্য অস্থায়ী বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সত্য হইলেও এ সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া দেখিবেন; মেস্‌মেরিক্‌ আরোগ্য স্থায়ী হইবেই হইবে।

পর পর কতকগুলি লোকের হাত একে একে লইয়া চিৎ করিয়া রাখিয়া তোমার নিজের দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলী গুলির অগ্রভাগ, তাহার হাতে স্পর্শ না করিয়া অথচ খুব নিকট দিয়া কব্জি হইতে বরাবর নীচের দিকে ধীরে ধীরে একমনে অর্থাৎ স্থির মনে চালাইতে থাকিলে অনেক বারের পর সেই সকল লোকের মধ্যে কেহ কেহ এক প্রকার বিশেষ ভাব অনুভব করিতে থাকে। ঐ সকল অনুভব শক্তি এক প্রকার হয় না। কেহ অঙ্গ গরম,

কেহ অল্প ঠাণ্ডা, কেহ ঝিন্ ঝিন্ বা কুট কুট করা ইত্যাদি অনুভব করিতে থাকেন।

ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ প্রকার অনুভব বেশী বোধ করে, তাহাকে লইয়া তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া ঐরূপ করিলেও সে তাহা বলিতে পারে। আবার এমন হইতেও পারে, চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়ায় মনের গোলযোগে বুঝিতে নাও পারে, কিন্তু প্রায়ই বুঝিতে পারে।

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া জান্তব শক্তি বাহির হইয়া থাকে এবং তাহা ঐ ব্যক্তির হাতে ঐ প্রকার অনুভূতি প্রদান করিতে থাকে।

মানব শরীরে জগদীশ্বর এমন কতকগুলি যন্ত্র দিয়াছেন, যাহাতে শরীরের উত্তাপ ও ঐ উত্তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করে; ঐ উত্তাপকে আমরা জান্তব উত্তাপ বা এনিমেল্ ম্যাগ্নেটিজাম্ বলিয়া থাকি। ইহার ক্রিয়া যেন কতকটা বিদ্যুতের মত, কিন্তু ঠিক তেমন নয়, বর্ণ তফাৎ, কার্য্যও তফাৎ, বিদ্যুতের আলোর বর্ণ লাল, কিন্তু ইহার বর্ণ সকল লোকের এক প্রকার না হইতেও পারে। তবে প্রায়ই নীলাভ।

ইহা শরীরের সকল স্থান দিয়া সর্ব্বদাই বাহির হইতেছে,

তন্মধ্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও ওষ্ঠের অগ্রভাগ দিয়া বেশী বেশী বাহির হয়। ইহা পাঠক মহাশয়গণ অবগত আছেন। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি ঐ অনুভূতি বেশ অনুভব করিতে পারিবে; তাহাকে লইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, সেই ব্যক্তি সহজে ও শীঘ্র তোমার আয়ত্তাধীনে আসিবে।

পাশদিবার নিয়ম।

প্রথম উপায়।

পাশ দিবার সময় নিজের দু হাতের অঙ্গুলি গুলি ঐ ব্যক্তির অভিমুখীন করিয়া উহাব মস্তকের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে মুখমণ্ডলের উপর দিয়া পেট বা পা পর্য্যন্ত টানিয়া আনিবে, কিন্তু তাহার শরীর স্পর্শ করিবে না অথচ শরীরের খুব নিকট দিয়া অঙ্গুলি চালাইতে থাকিবে। এইরূপ করিবার সময় তোমার **মনস্থির সংযত, প্রফুল্লিত ও একাগ্র হওয়া চাই এবং ইচ্ছাশক্তিও খুব দৃঢ় রাখিতে** হইবে। মন যেন কদাচ কোন বিষয়ে বিচলিত না হয়; তজ্জন্য **একাগ্রতা** পূর্ব্ব হইতে অভ্যাস করিতে হয়।

মনের একাগ্রতা।

মনের একাগ্রতার কথা বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। তত কথা বলিবার স্থানাভাব। তবে আমাদের মনের কথা দুএকটী সংক্ষেপে বলিতে বাধ্য হইলাম।

আমাদের মন পাঁচভাগে বিভক্ত।

১। **ক্ষিপ্ত**। ২। **বিক্ষিপ্ত**। ৩। **মূঢ়** ৪। **একাগ্র** ৫। **নিরুদ্ধ**। মেস্‌মেরিক্ কার্য্য সাধনে প্রথম তিনটী অবস্থা রাখিলে কোন মতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। ৪র্থ। **একাগ্রতা** নিতান্ত দরকার। একাগ্রতা কাহাকে বলে?

একাগ্রতা বা একতান্ একই কথা। মন যখন কোন একটী বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় স্থির ভাব ধারণ করে, একটুও কাঁপে না, সেই ধ্যেয় বস্তুতে নিষ্কম্প ভাবে দীপশিখার ন্যায় স্থির থাকে; তাহাকে **একাগ্রতা** কহে। এই একাগ্রতা অভ্যাস করিবার উপায় যোগ শাস্ত্রে বিস্তর প্রকারে সাধনের নিয়ম আছে। মনকে একাগ্র করিতে হইলে ধ্যান দরকার হয়। ধ্যান অর্থ যে কোন একটী ধ্যেয় বস্তুতে চিন্তাস্রোত বাহিত করা। সেই বস্তুটী কি? অনেক। তবে সাধকের অভিমত হওয়া চাই। পাতঞ্জলি বলিয়াছেন—

যথাভিমত ধ্যানাদ্বা।

অর্থাৎ নিজের মনোজ্ঞ বস্তু ধ্যান করিবেন। যাহাতে মনের প্রফুল্লতা আসে, তাহাই নিয়ত ধ্যান করিবেন। একাগ্রতা অভ্যাসের এই উৎকৃষ্ট উপায়। তা বলিয়া স্ত্রীর মূর্ত্তি ভাবিও না। যাহাতে কোন কুভাব না আসে অথচ মন প্রফুল্ল, ধীর, স্থির হয়, তাহাই চিন্তা দ্বারা একাগ্রতা আগে অভ্যাস করিবে, একাগ্রতা যাহার যত বেশী হয়, তাহার ক্রিয়াসাধন শীঘ্র ও সুন্দর হয়। তাহার ক্রিয়াপাত্র তত শীঘ্র মেস্‌মেরাইজ্‌ হয়। তাহার কোন কষ্ট হয় না। তিনি তত শীঘ্র রোগ আরোগ্য করিতে পারেন এবং সেই আরোগ্য তত স্থায়ী হয়। ক্রিয়াপাত্রও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া থাকে। এই একাগ্রতা অভ্যাসের জন্য আমি এক উপায় বলি, করিয়া দেখিতে পারেন, সহজে হইবে।

একটা তামার পয়সা চেপ্টা করিয়া অর্থাৎ অক্ষরগুলি না থাকে। তৎপার্শ্বে একটী ছিদ্র করিয়া সুতা বাঁধিবেন, এবং নিজে সরলভাবেবসিয়া চক্ষের সমতলে দেয়ালের গায়ে একটা পেরেক পুঁতিয়া তাহাতে সেই চাকৃতিটা ঝোলাইবেন এবং সাবকাশ মত তৎ সম্মুখে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিবেন। এক দৃষ্টে এক মনে তাকাইয়া থাকিবার কালীন অন্য চিন্তা মনে আসিতে দিবেন না। মন

যখনই অন্যচিন্তায় সরিয়া যাইবে ; তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা হইতে লইয়া পুনর্ব্বার সেই তাম্র ফলকে নিয়োজিত করিবেন। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইতে থাকিবে। ক্রমেই অনেকক্ষণ মন রাখিবার শক্তি জন্মাইবে, একাগ্রতা বৃদ্ধি হইবে। যাক্ একাগ্রতার কথা আর বলিব না। ইহা জানিবার যাঁহার দরকার হইবে, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন কিম্বা নিজের গুরুর নিকট শিক্ষা করিবেন। এক্ষণে পাশ দিবার বিষয় দেখা যাউক।

ক্রিয়াপাত্র অর্থাৎ যাহার উপর পরীক্ষা হইতেছে, সে সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত অর্থাৎ মনে কোন বিষয়ে আগ্রহ বা চিন্তা না থাকে এবং কোন শব্দ দ্বারা তাহার শান্তিভঙ্গ না হয়। তিনি ক্রিয়া সাধকের চক্ষের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবেন এবং ক্রিয়া সাধকও ক্রিয়াপাত্রের প্রতি স্থিরনেত্রে, অচল, অটল নেত্রে তাকাইয়া থাকিবেন এবং পাশ দিতে থাকিবেন। অবিচলিত ভাবে ধীর ও স্থির মনে কিছুক্ষণ এইরূপ করিতে থাকিলে ক্রিয়া পাত্রের পূর্ব্বোল্লিখিত **গরম, ঠাণ্ডা, সুড়সুড়ি, চিন্‌চিনি, ঝিন্‌ঝিনি** ইত্যাদি যে কোন প্রকার অনুভব হইতে থাকিবে। ইহা আবার সকলকার সমান হয় না! কাহারও **অল্প**, কাহারও **মধ্যম**, কাহারও বা **তীব্র**

প্রকারের অনুভব হইতে থাকে। যে যত তীব্র অনুভব করে, সে তত শীঘ্রই আয়ত্তাধীনে আসিয়া পড়ে। মধ্যম ব্যক্তি বিলম্বে, আর অধম ব্যক্তি বহুবারের পর, বহু বিলম্বে আয়ত্তাধীনে আসিয়া থাকে। ক্রিয়াশীল ব্যক্তি কদাচ হতাশ হইবেন না। হতাশ হইলে তিনি তাঁহাকে আর আয়ত্তাধীনে আনিতে পারিবেন না, কিম্বা বহু কষ্টে বহুবারে আনিতে পারিবেন।

সুস্থকায়, **ধৈর্য্যশীল, বলবান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রচিত্ত** ব্যক্তি চেষ্টা করিলে অতি সহজে এবং শীঘ্র সকলকেই আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন; এবং নিজ কার্য্য সাধন করিতে পারেন। অধ্যবসায়ী প্রায় কখনই বিফল হয়েন না। তবে প্রথম প্রথম হয় তো একটু বিলম্ব হয়। পরে ক্রিয়াপাত্র যখন আয়ত্তাধীনে আসে, তখন দুচার মিনিটেই বিলক্ষণ আয়ত্ত হয়।

পাশ দিবার দ্বিতীয় উপায়।

ক্রিয়া পাত্রের খুব নিকটে সাম্‌নাসামনি বসিয়া তাহার দুই অঙ্গুষ্ঠ দুহাতে ধরিয়া, তাহার চক্ষের উপর নিজের চক্ষু রাখিবে এবং তাহাকেও ঐরূপ চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিতে কহিবে। এইরূপে তাহার প্রতি স্থির, ধীর, ও একাগ্র-ভাবে মন সংযত রাখিবে। ইহাতে পূর্ব্ব প্রকারের পাশ

দেওয়া অপেক্ষা অতি সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু এই উভয় প্রকার প্রণালীর মধ্যে কেহ কোন প্রকার সুবিধা বোধ করেন, সুতরাং কোন্‌টী যে সহজ, বলা যায় না।

যাঁহারা এই উভয় প্রকার প্রক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে একই ব্যক্তিতে করিয়া থাকেন, তাহাতে অনেকে বেশ সুবিধা বোধ করেন।

আবশ্যকীয় দুইটী বিষয়।

১ম।—পাত্রের মনে মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তাহার মন অনাসক্ত এবং ইচ্ছুকভাব থাকা নিতান্ত দরকার। মনের মধ্যে কোন প্রকার বেগবতী গুরুতর চিন্তা থাকিলে কিম্বা সাধকের ইচ্ছাব অধীন হইব না; এইরূপ দৃঢ় জেদ্ থাকিলে তাহাকে আয়ত্তাধীনে আনা অতীব কঠিন, কষ্ট সাধ্য কিম্বা অসম্ভব হয়। পাত্রের মনে ইচ্ছাভাব থাকা ও মন স্থির থাকা নিতান্তই দরকার।

২য়।—সাধকের মনের একাগ্রতা যে বিশেষরূপে দরকার তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে; তজ্জন্য তথায় কোন গোলমাল না হয়, কিম্বা ফুসফুস্ গুজ্‌গাজ্ কথা বার্ত্তা না হয়, অথবা বার বার বসা ও উঠা বা কাশী হাঁচি

আদি কোন বাধা না হয়, এরূপ হইলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কার্য্য সাধনে ব্যাঘাত হয়।

আরও বলি যে পাত্র বিশেষ অভিভাব্য (Susceptible) অর্থাৎ সহজে কোন বাহ্যিক প্রভাবের অধীন হইয়া যায় অর্থাৎ কোমল প্রকৃতি, তাহারা অতি উৎকৃষ্ট পাত্র।

সাধকের একাগ্রতার তীব্রতানুসারে দূর হইতেও পাত্রকে নিজের আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন। কিন্তু এইরূপে মায়ানিদ্রা বা হিপ নোটাইজ্‌ করিতে একটু অসুবিধা হয়। পাত্রের নিদ্রার অবস্থা ছাড়াইয়া আর একটু বেশী সংজ্ঞা লোপের অবস্থা আনা কিছু কঠিন। এ সকলের প্রমাণ পূর্ব্বে পাইয়াছেন।

মেস্‌মেরিজম্‌ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইল। এক্ষণে এই সকল প্রক্রিয়া অধিকক্ষণ নির্ব্বাহিত হইলে আমরা যে সকল অলৌকিক্‌ বা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখিতে পাই, তাহা বলিব।

১। চক্ষুপাতাগুলি স্পন্দিত হইয়া চক্ষু বুজিয়া আসিতে থাকে। যাহাদের চক্ষু খোলা থাকে, তাহাদের চক্ষে যেন একটা জাল পড়িয়া আসিতেছে, মনে হয়। তখন সে কোন বস্তু দেখিতে পায় না। তখন একটা তন্দ্রাভাব

আসিয়া হঠাৎ সংজ্ঞালোপ হইয়া ইচ্ছাশক্তি বা গতিশক্তি লোপ হয়। তবে সাধকের আজ্ঞা বা হুকুম পাইলে গতি-শক্তি হইয়া থাকে। তারপর জাগ্রত হইয়া কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, বলিতে পারে না। যেন ঐ সময়টা একটা ফাঁকের মত চলিয়া যায়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জাগিয়া উঠে। কতকক্ষণ ঘুমাইয়াছে, তাহাও বলিতে পারে না। ইহারই নাম মেস্‌মেরিক্ স্লীপ্‌ বা মোহ-নিদ্রা। অবস্থানুসারে ইহার তীব্রতার তারতম্য হইতে পারে অর্থাৎ কম বেশী হয়। প্রথমে নানা রকম অনুভূতি, পরে নিদ্রা আসে। তারপর সংজ্ঞা লোপ হইয়া ইচ্ছাশক্তি ও গতিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

আবার জ্ঞান বজায় রাখিয়াও অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যাপার দেখাইতে পারা যায়। জ্ঞান বজায় রাখিয়া ঐ সকল করিতে হইলে একটু একটু বিশেষ প্রণালী সাধনা করিতে হয়। পূর্ব্বের প্রণালী অনুসারে প্রায় নিদ্রাই আসিয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থাতেও ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করিতে পারা না যায়, এমত নহে। যদি নিদ্রা আসিবার ঠিক পূর্ব্বে প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা যায়; তাহা হইলে ঐ অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাবস্থাতেই ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

নিদ্রিতাবস্থা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর নিদ্রিতাবস্থার ঘটনা কিছুই মনে থাকে না। অতএব বুঝা গেল যে, ঐ সময়টা তাহার নিজের ফাঁক বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সময়টা যেন জড় বা জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সে সময়টায় সে যেন অজ্ঞান ছিল, বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞান নহে। সেই সময়টা সে নানা প্রকার চিন্তায় নানাপ্রকার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ বা নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিল। ইহাই অত্যন্ত **আশ্চর্য্যের বিষয় ও অলৌকিক ব্যাপার।**

নিদ্রিতাবস্থার বিশিষ্টতা।

১। এই নিদ্রাকে জাগ্রত সুষুপ্তি বলা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে **শমনম্‌ বুলিজম্‌** (Sam nam bulisym) কহিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত অর্থ নিদ্রিতাবস্থায় সচেতনের ন্যায় কার্য্যাদি করিয়া বেড়ান। ইহাকে চলিত ভাষায় **"নিশিতে পাওয়া"** কহে।

এই অবস্থাতে গভীর ও প্রশান্ত নিদ্রাও বলা যায়। কারণ এই নিদ্রার মধ্যে জ্ঞানের ক্ষণিক বিকাশও হয় না; অথচ তাহাকে ক্রিয়া সাধক যে কথা জিজ্ঞাসা করেন,

তৎক্ষণাৎ তাহার প্রকৃত উত্তর দেয়। কখনই বেহিসাবি বা অপ্রকৃত উত্তর দেয় না। যদি কোন কথায় তাহার সন্দেহ থাকে, তবে "জানি না" বলে।

যে বিষয় তাহার নিশ্চয় জানা নাই, তাহাতে সে "হাঁ বা না" বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছা ভাব প্রকাশ করে।

ক্রিয়া সাধক দৃঢ়তার সহিত কোন আদেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করে। বেড়াইতে বলিলে উঠিয়া বেড়াইতে থাকে; তৎকালে প্রায় তাহার চক্ষু মুদ্রিত থাকে, অথবা তাকাইয়া থাকিলেও চক্ষে কিছু দেখে না। চক্ষে আলোর স্পর্শ বোধ কিছু মাত্র থাকে না। চক্ষু উল্টান থাকে। তাহার চলিবার পথে কোন জিনিষ আছে কিনা, জানিবার অলৌকিক ক্ষমতা থাকে, যাহা সাধারণের থাকে না।

ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঘটনা হইতে থাকে; একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সময় বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ ক্রিয়াশূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের আপনাপনি নিশিতে পায়, তাহাদেরও এইরূপ ঘটে।

• মেস্‌মেরিক্ নিদ্রা ও নিশিতে পাওয়া এই দুই প্রকারের অবস্থা প্রায় একই প্রকারের হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে আবার শ্রবণ শক্তি অতীব তীব্র হয়। সকল স্থলে এরূপ হয় না। যেমন অন্ধের শ্রবণ-শক্তি ও ঘ্রাণশক্তি স্বভাবতঃ প্রবল হয়; বোধ হয় চক্ষুর ক্রিয়া না থাকায় শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও অনুভব-শক্তিপ্রবল হইয়া থাকে। এইজন্য পথের দ্রব্যের অনু-ভূতি মেস্‌মেরিক্‌ নিদ্রার অবস্থায় যেমন হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ স্বপ্ন ভ্রমণকারীও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

স্বপ্ন ভ্রমণের সময় যত বেশী শব্দ হউক না কেন সে শুনিতে পায় না। খুব বেশী উচ্চ শব্দে যদি নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তবে বিপদ আসিতে পারে, অল্প শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। মেস্‌মেরিক্‌ নিদ্রায় কোন শব্দই শুনিতে পায় না, সম্পূর্ণ কালা হইয়া যায়। এমন কি কানের কাছে বন্দু-কের আওয়াজও শুনিতে পায় না। এই বধিরতা নিদ্রার অবস্থা বিশেষে হয়, আবার ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছানুসারে সকল অবস্থাতেই হইতে পারে। ক্রিয়া সাধক যদি বলিয়া দেন, তবে আর কিছুই শুনিতে পাইবে না।

২। প্রথম প্রথম নিদ্রা আসিবার সময় অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ করিয়া যেমন পরিশ্রান্ত হয় তদ্রূপ, কিম্বা মাতালের মত হইয়া ঝিমাইতে থাকে। রাত্রিতে যাত্রা আদি শুনিবার সময় যেমন লোকে

তন্ময় হইয়া নিদ্রাকর্ষণের মত ঝিমায়, ঠিক সেই মত হইতে থাকে, কিন্তু তারপর যখন তাহার সহিত কথা কহা যায়, তখন বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠে। যদিও চক্ষু মুদ্রিত থাকে, কিন্তু বেশ চালাকির ভাব দেখা যায়। খুব বেশী নিদ্রার সময়ও এই সকল পরিবর্ত্তন বেশী রকমের হয়। তাহার জাগ্রতাবস্থার অপেক্ষাও তাহাকে উন্নত প্রকৃতির অন্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। যেন নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলি অভিভূত হইয়া গিয়া বুদ্ধিবৃত্তি উচ্চ ও উৎকৃষ্ট ভাবগুলি বিকসিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ফলতঃ মেস্‌মেরিক্ নিদ্রার উচ্চতম অবস্থায় মুখশ্রী পরম সৌন্দর্য্যভাব, যেন স্বর্গীয় ভাবের আভাস দেখা যায়। সহজ অবস্থায় সাধারণতঃ সে যে সুরে কথাবার্ত্তা কহিত, মেস্‌মেরিক্ নিদ্রাকালে সে, সে স্সুরে কথা কহে না। যেমন মুখের ভাব স্বর্গীয় হয়, কথার সুরও তেমনি সুমধুর ভাবযুক্ত হয়। কখন বা শোক প্রকাশক কাতর সুর হইতে থাকে। ইহা প্রায়ই যে স্থলে নিজের মৃত আত্মীয় ব্যক্তির আন্দোলন করে, সেই সময়েই ঐ কাতর ভাব সুর হইয়া থাকে। আবার যখন সর্ব্বোচ্চ অবস্থা আসে; তখন মুখের ভাব স্বর্গীয় ভাবাক্রান্ত, মনের পবিত্র ভাব-ব্যঞ্জক হাঁসি প্রকাশ পায়। গলার সুর এক নূতন প্রকারেরহইয়া যায়।

মেস্‌মেরিক্‌ নিদ্রিত ব্যক্তির সংজ্ঞা তাহার সাধারণ সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সে অবস্থায় যেন তাহার জীবনের ভিন্নাবস্থা মনে হয়। তাহার সাধারণ অবস্থাপেক্ষা শত সহস্রগুণে উন্নত মনে হয়।

মেস্‌মেরিক্‌ নিদ্রাভঙ্গের পর সে নিদ্রিতাবস্থায় ঘ্রাণ, আস্বাদন, শ্রবণ বা যা কিছু করিয়াছে বা বলিয়াছে, তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না কিন্তু আবার যখন তাহাকে মেস্‌-মেরিক্‌ নিদ্রায় আনয়ন করা যায়, তখন সে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত বার নিদ্রিত হইয়াছিল, সমস্ত বারের সমস্ত ঘটনাগুলি মনে করিতে পারে। প্রায়ই ঠিক ঠিক মনে হয়; কখন বা দুই একটা তফাৎ হতেও পারে। প্রকৃত যেন সে অবস্থায় তাহার একটা নূতন জীবন আসে, তাহার সংজ্ঞাও যেন দুভাগে বিভক্ত, বোলে মনে হয়, অথচ সাধারণ অবস্থা হইতে যে বিশেষ বিভিন্ন হয়, তাও নয়।

নিদ্রিতাবস্থায় নিজের বিষয় সম্বন্ধে ঠিক্‌ ঠাক্‌ বলে। তাহার পরিচিত ব্যক্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা করে, বর্ণনা করে কিন্তু তাহার নাম উল্লেখ করে না বা পারে না। নাম বলিলে সায় দেয়, কিন্তু নিজে বলে না।

অনেক সময় আত্মবিস্মৃতি ঘটে। তাহার নিজের নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না, কিম্বা ক্রিয়া সাধকের নাম

বলে, অথচ আর আর সব ঠিক থাকে। বেহুস হয় না, ঠিক ঠিক কথা কহে।

বেশী বেশী সময় ক্রিয়া সাধক বা অন্য ব্যক্তিকে অযথার্থ নামে ডাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যতবার ডাকিবে, ঠিক সেই নামেই ডাকিবে; আর নাম পরিবর্ত্তন হইবে না। আর একটী আশ্চর্য্য ও বিপদের কথা বলি, অনেকের অনেক দিন যাবৎ দুটী বিভক্ত সংজ্ঞা থাকে। এমনও ঘটে যে, বাল্যাবস্থায় যা কিছু শিখিয়াছিল, সব ভুলিয়া যায়, সুতরাং আবার শিখাইতে হয়। এ অবস্থা প্রায়ই হয় না।

৩। নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষু মুদ্রিত থাকে, কিন্তু যদি তাহার মনকে কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করা যায়, তবে সে এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহে, যেন ঠিক সেই বস্তুটীকে দেখিতেছে। দেখিবার চেষ্টাও করে, বুঝা যায়। কিন্তু দেখিবার যত বেশী চেষ্টা করে, ততই যেন তাহার চক্ষু বুজিয়া আসে। কোন বস্তু হাতে দিলে হাত বুলাইয়া দেখে এবং চক্ষে দেখার মত ঠিক ঠিক বলিতে পারে বা বলে। ইহা তাহার স্পর্শবোধ আধিক্য জন্যই হউক বা অন্য কোন উপায় দ্বারাই হউক, ঠিক্ ঠিক্ বলে। যদি কোন বস্তু তাহার কপালে বা মস্তকের পশ্চাতে স্পর্শ করা যায়, তাহা

হইলেও তাহার ঠিক্‌ ঠিক্‌ বর্ণনা করিতে পারে। আবার যদি ক্রিয়া সাধক কোন বস্তু তাহার চক্ষের সাম্‌নে ধরে, তবে তাহা দেখিবার যত্ন করে, এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়। কখন বা কষ্টে অনুভব করে। এইটী নিদ্রার প্রথমাবস্থায় প্রায়ই ঘটে। এই সময় তাহার দিব্যদৃষ্টি (ক্লিয়ার ভয়েন্স Clair Voyance) হয়। পরে নিদ্রার সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় বিশেষ দীপ্তি পায়। তবে বস্তুটীকে তাহার খুব নিকটে রাখিতে হয়। দূরে রাখিলে সে বলিতে পারে না। এই দিব্য দৃষ্টির এত প্রভেদ দেখা যায়, তজ্জন্য অনেক কথা বলিতে হয়। ইহা যেন একটী স্বতন্ত্র বিষয় মনে হয়। ইহা এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়; তাহার সীমা ঠিক করিয়া বলা যায় না বা অসম্ভব। দিব্য দৃষ্টির অবস্থায় যে সকল অলৌকিক বা আশ্চর্য্য ঘটনা সকল হয়, তখন প্রথমাবস্থার ব্যাপারগুলিও থাকে, কিন্তু তাহা ঐ অদ্ভুত ঘটনার সহিত জড়িত হওয়ায় তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট হয় না বলিয়া, বুঝা যায় না।

৪। নিদ্রিত ব্যক্তি কেবল ক্রিয়া সাধকের কথা শুনিতে পায়, অন্য কাহারও কথা শুনিতে পায় না। কখন কখন বা অন্যের কথাও শুনিতে পায় এবং তাহাদের কথারও উত্তর দেয়, কিন্তু সাধকের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অন্যের কথা

শুনিতে পায় না কিম্বা ক্রিয়াসাধক যদি বলিয়া দেয়, কাহারও কথা শুনিতে পাইও না, তবে তার কাহারও উচ্চৈঃস্বরে কথাও শুনিতে পায় না। তখন ক্রিয়াসাধক তাহার হাতের অঙ্গুলিতে মুখ দিয়া কথা কহিলে শুনিতে পায় ও প্রশ্নের উত্তর দেয়। কখন কখন বা অন্যে বলিলেও শুনিতে পায়। কখন ক্রিয়াসাধক যদি অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াদেন, তবে শুনিতে পায়। অন্যথায় উচ্চশব্দ এমন কি পিস্তলের শব্দও কিছু মাত্র শুনিতে পায় না। তাহার আলোচিত বিষয় অবিরামে বলিয়া যায়। কখন কখন তাহার মাথার উপর বা পেটের উপর বলিলে শুনিতে পায়।

অনেক সময়ই এমন ঘটে যে, নিদ্রিত ব্যক্তি প্রথম প্রথম অন্যের কথা বা গোলমাল শুনিতে থাকে; সহজে নিদ্রিত হয় না; তৎকালে ক্রিয়াসাধক শুনিতে নিষেধ করিলে আর অন্যের কথা বা গোলমাল কিছুই শুনিতে পায় না এবং শীঘ্রই প্রকৃতনিদ্রা আনয়ন করিতে পারেন। যেখানে সাধক পাত্রের উপর বেশ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, সেইখানেই তিনি এ কার্য্যে সক্ষম হন।

এক্ষণে আমি এক কথা বলিয়া রাখি, এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা যন্ত্রণাদির নিবারণ করা যায়, আর কোন যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। এইরূপে অনেকে হাত বুলাইয়া আধ-

কপালে শিরঃপীড়া ইত্যাদি স্নায়বীয় বেদনা ভাল করিয়া থাকেন ও পারেন, তাহাতে নিদ্রা আনয়নের প্রয়োজন হয় না। মেস্‌মেরিক্‌ ক্রিয়া দ্বারা অনুভব শক্তির লোপ করিলে, তৎপরে তাহার কোন অসুখজনক লক্ষণ প্রকাশ হয় না।

৫। কদাচিৎ দেখা যায়, মেস্‌মেরিক্‌ নিদ্রাভঙ্গের পর অসুস্থকর যাতনা হইতে থাকে কিম্বা নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে কষ্ট পাইতে হয়, সে কেবল আনাড়ী ক্রিয়াসাধকের দোষেই হয়।

মেস্‌মেরিক্‌ নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইলে বেশ সুস্থ ও স্থির চিত্তে থাকিয়া, ব্যস্ত বা ভীত না হইয়া উল্টা পাশ অর্থাৎ নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখে পাশ দিতে হয়। তৎকালে ক্রিয়াসাধক যদি ব্যতিব্যস্ত, চঞ্চল বা ভীত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন বা রাগিয়া যান, তবেই বিপদ। তখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হইয়া হয় তো আক্ষেপ বা তড়্‌কা (ফিট্‌) হইতে থাকে। তা দেখিয়া ক্রিয়াসাধক আরও ব্যাকুল হইয়া পড়েন, নিদ্রিত ব্যক্তি তখন আর শুনিতে পায় না। ক্রিয়াসাধক যতই ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইতে থাকেন, বিপদ ততই গুরুতর হইয়া উঠে। সুতরাং ক্রিয়াসাধক প্রথম প্রথম কার্য্যে হাত দিবার সময় একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ

সাধককে সঙ্গে রাখিয়া কার্য্যে নামাই ভাল। অন্যথায় মেস্‌মেরিক্ চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ বিপদ কাল উপস্থিত হইলে রক্ষা করিবার লোক সঙ্গে থাকা মঙ্গলজনক।

যদি বিপরীত বা ঊর্দ্ধমুখীন পাশ দিতে জানা না থাকে, কেমন কোরে ঘুম ভাঙ্গাতে হয়, জানা না থাকে; তবে ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত না হইয়া স্থির ভাবে থাকিবেন। পাত্রকে অন্য কেহ স্পর্শ না করে। স্পর্শ করিলে ক্রস্ (cross) বা ব্যভিচার মেস্‌মেরিক্ দোষ ঘটিবে। তখন আরও অনিষ্টের কারণ হইবে।

যদি ক্রিয়াসাধক নিদ্রিতের ঘুম ভাঙ্গাইবার প্রণালী না জানেন, তবে তাহাকে নিদ্রিতই রাখিবেন, আপনাপনি নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। একটু বিলম্বে আপনি জাগিবে। কদাচ তাহাকে নাড়াচাড়া করিবেন না, স্পর্শ করিবেন, না। কোন রকমে তাহাকে বিরক্ত করিবেন না। এই নিদ্রা কখনই এক দুই বা তিন ঘণ্টার বেশী থাকে না। তাহাকে নাড়াচাড়া না করাই উৎকৃষ্ট উপায়। তাহাতে কোন ক্ষতি বা কষ্ট হয় না। সুনিদ্রার পর আপনাপনি নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় হয়। নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক থাকে। তবে নাড়াচাড়া, বিরক্ত, খোঁচাখুঁচি করিলেই বিপদ! নানা গোলমাল হইবে।

বহুদর্শী, স্থিরচিত্ত, বিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে কোন ভয় নাই বা বিপদের আশঙ্কা নাই।

হাত পা ভাঙ্গা ইত্যাদি আঘাতিত ব্যক্তিকে সহজে আয়ত্তাধীনে আনা যায় না, কিন্তু যাঁহারা কার্য্যদক্ষ তাঁহারা বেশ পারেন এবং তাঁহারা বহু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

এই ব্যাপার অল্প বয়স হইতে শিক্ষা বা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে অতি সহজ হয়। তৎকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সহজে সুসাধ্য হয়।

৬। নিদ্রিতাবস্থায় প্রায় সকল অবস্থাতেই ক্রিয়া পাত্র ক্রিয়া সাধকের আয়ত্তাধীনে থাকে। ক্রিয়া সাধক তাহার নিদ্রার সময় নির্ণয় করিয়া দিলে ঠিক ততক্ষণ সে নিদ্রিত থাকে; তাহার এক মিনিট তফাৎ হয় না। জাগিয়া উঠার পর তাহার শরীর পূর্ব্বের মত বেশ সুস্থ থাকে। ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছাধীন থাকিলে কিম্বা ক্রিয়া সাধকের ক্ষমতা থাকিলে, অনেক সময় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হইলে বা কোন স্থানে দারুণ বেদনা ভাল করিতে হইলে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময় নিদ্রিত রাখিবার দরকার হয়। অনেক সময় বিপদ জনক ক্লোরোফরমের দরকার হয় না, অর্থব্যয়ও হয় না।

যাতনা নিবারণের জন্য মর্ফিয়া আদি বিষ খাওয়াতেও হয় না।

ক্রিয়া সাধক নিদ্রাভঙ্গের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনাপনি নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন কোন ক্লেশ বা যাতনা হয় না। ক্রিয়া পাত্রকে অনেক কথা কহাইলে কখন কখন সে ক্লান্ত হওয়ায় জাগিতে চাহে ও বলে। তখন তাহাকে জাগাইয়া দেওয়াই ভাল; নতুবা পরিশ্রম জন্য মনের স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন ঘটে। এস্থলে একটী কেস বলি—

৭। হুগলী জেলা পাটনা নিবাসী..........বাবুর স্ত্রী অতি ভীষণ রোগে আক্রান্ত প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দারুণ যাতনা ভোগ হইতেছেন, জীবন আর বেশীক্ষণ নহে; এমন অবস্থায় আমি আহুত হইয়া বিপন্ন হইলাম।

মেস্‌মেরাইজ্ না করিলে স্ত্রী হত্যা হয়, অন্যথায় অন্যায় হয়; কারণ স্ত্রীলোকের মধ্যে **মাতা, ভগিনি, স্ত্রী ও কন্যা,** ব্যতিত অন্যকে মেস্‌মেরাইজ্ করা নিষেধ। কি করি অগত্যা মেস্‌মেরাইজ্ করিতেই হইল। তৎকালে বলিয়া দিলাম, আমি তাঁহার **পিতা**। পরে মেস্‌মেরিক্ নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাত্রি ১০টা হইতে ১টা ১০ মিনিট পর্য্যন্ত সুনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিতে বলিয়া

দিয়া পার্শ্বের ঘরে (নিকটে) রহিলাম। ঠিক সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াই বাবা বলিয়া আমার খোঁজ করিয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন। আর কখন তাঁহার সে রোগ হয় নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, আমাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিতেন। বাবার সঙ্গে স্ত্রীলোকে যেমন ভাবে কথা বার্ত্তা কহে, সেই ভাবেই কথা কহিতেন; কোন প্রকারে কুণ্ঠিত হইতেন না।

৮। ক্রিয়া সাধক নিদ্রার সময় নির্দ্দেশ করিয়া না দিলে দু তিন ঘণ্টার বেশী নিদ্রিত থাকে না। আর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়; তাহার ভবিষ্যৎ দর্শনশক্তি জন্মে। যদি নিদ্রার সময় নির্দ্দেশ না করিয়া দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি কতক্ষণ ঘুমাইবে" তবে একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলে এবং যখনই যতবার জিজ্ঞাসা করিবে; তাহার নিদ্রার সময়ের কত বাকী ঠিক করিয়া বলিবে। সময়ের কত বাকী আছে হিসাব করিয়া মিনিট পর্য্যন্ত বলিবে। একটুও হিসাবে বা গণনায় ভুল হইবে না।

এই অবস্থায় সে ভাবি বিষয় অনেক বলিতে পারে। যেন তাহার ভাবী দৃষ্টির স্ফুর্ত্তি দেখা যায়। তাহার নিজের শরীরের ভাবী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জাগ্রত হওয়ার পর তৎকালীন ঘটনা কিছুই মনে থাকে না, কিন্তু কাহারও কাহারও কতকাংশ, কাহারও সমস্তই মনে থাকে। যাহাদের কিছুই মনে থাকে না; ক্রিয়া সাধকের আদেশানুসারে মনে রাখিতে পারে। ক্রিয়া সাধক নিদ্রিতাবস্থায় আদেশ করিলে, জাগিয়া সমস্ত বা আংশিক মনে রাখিতে পারে। আবার ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছায় নিদ্রিতাবস্থার কার্য্য কলাপ সমস্ত কিম্বা আংশিক ভুলাইয়া দিতেও পারেন। সময় সময় ইহা অত্যন্ত দরকার হয়।

পূর্ব্বে যতবার ক্রিয়াপাত্র নিদ্রিত হইয়াছে; পর পর নিদ্রাকালীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ঘটনাবলির সহিত যেন সম্বন্ধ থাকে। তাহার নৈসর্গিক স্মৃতিশক্তি অনুসারে পূর্ব্ববারের ঘটনাবলি মনে করিতে পারে।

নিদ্রিতাবস্থাতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জাগ্রতাবস্থায় ভুলিয়া যায়, কিন্তু আবার নিদ্রিতাবস্থায় সেই সেই পূর্ব্ব নিদ্রিতাবস্থার ঘটনা সকল মনে করিতে পারে। এই দুটী বিভক্ত ও দ্বিরূপ সংজ্ঞার ফল। তবে ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা উভয় অবস্থাতেই তৎকালের জন্য স্মরণশক্তির লোপ হইতে পারে। উচ্চ সাধক জ্ঞানাবস্থাতেও ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা

ক্রিয়াপাত্রের স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার বশীভূত করিতে পারেন।

৯। ক্রিয়া পাত্রের নিদ্রিতাবস্থায় ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত ঘটনাও তিনি ভুলাইয়া দিতে পারেন। ক্রিয়াপাত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিদ্রাকালীন ঘটনা সকল তো ভুলাইয়া দিতে পারেনই, তা'ছাড়া তাহাকে কখনও মেস্‌মেরাইজ্‌ করা হইয়াছে, তাহাও ভুলাইয়া দেওয়া যায়। কখন কখন সে নিজেই নিজের নাম ভুলিয়া যায়। নাম ভুলিয়া না গেলেও তাহার নাম ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছাশক্তি ও আদেশানুসারে ভুলিয়া যায়। আবারও ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা, (তিনি ইচ্ছা করিলে) ক্রিয়া পাত্রের কোন অঙ্গ অচল করিয়া উঠিবার শক্তি লোপ বা বাক্‌শক্তি লোপ করিতে পারেন, আবার তাহা আরোগ্য করিতেও পারেন। এক্ষণে বুঝা গেল যে, ক্রিয়া পাত্র ক্রিয়া সাধকের সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীন। ফলতঃ ক্রিয়াপাত্রের সমস্ত ঐচ্ছিক পেশীগুলিও ক্রিয়া সাধকের ইচ্ছাধীনে আসিয়া পড়ে।

১০। ক্রিয়া সাধক মনে করিলে পাত্রকে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গি ও প্রত্যেক কথার নকল করাইতে পারেন। সাধক ক্রিয়া পাত্রের অজ্ঞাত ভাষায় কথা

কহিলে পাত্রও সেই সেই স্বরে ও সেই ভাষায় কথা অবিকল কহিতে পারে। উচ্চারণের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হইবে না। বিশেষ সতর্কতার সহিত মনোযোগ দিয়া শুনিলেও কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না। সাধকের অঙ্গ ভঙ্গি হাঁসি ঠিক ঠিক অনুকরণ করিবে। সাধক যেখানে থাকিয়াই করুন; সেও তাহাই করিবে। তৎকালীন পাত্রের চক্ষু মুদ্রিতই থাকিবে। ক্রিয়া পাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই এরূপ অনুকরণ করিতে পারে না।

১১। সাধক ভিন্ন নিদ্রিত ব্যক্তির সহিত যদি অন্য কাহারও কথা কহিবার বা কার্য্য করিবার দরকার হয়, তবে সাধক তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতে পারেন। তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত স্পর্শ করাইয়া দিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কখন কখন নিদ্রিত ব্যক্তিকে অন্যের সহিত আলাপ করিবার জন্য ক্রিয়া-সাধককে বলিয়া দিতে হয়। তখন ক্রিয়া সাধকের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গেও তাহাই হয়। আবার এক মজার কথা—কখন কখন এমনও ঘটে যে, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি আবার ক্রিয়া সাধকের সঙ্গে সম্বন্ধ বদ্ধ করিয়া না দিলে ক্রিয়া পাত্র আর ক্রিয়া-সাধকের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে না। যখন ক্রিয়া

পাত্রের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেওয়া যায়, তখন প্রায়ই ক্রিয়াপাত্র চম্‌কিয়া উঠে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হয় না, এবং তাহার পরই নিদ্রিত ব্যক্তির সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধ বদ্ধ হয়। আবার এইরূপে সাধকের আয়ত্তাধীনে আনিতে হয়।

১২। সাধক মনে করিলে নিদ্রিত ব্যক্তির মনের প্রত্যেক ভাবগতি প্রকাশ করাইতে পারেন। ইহার অনেক প্রকার উপায় আছে। মস্তকের উপর হাত দিলেই তাহার ক্রিয়ানুযায়ী কার্য্যগুলি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। ইহাকে "ফ্রেনো-মেস্‌মেরিজম্‌" কহে। আমাদের মস্তিষ্কে অনেকগুলি লোব (অংশ) আছে; সেই সকল লোবের প্রত্যেকের ক্রিয়া পৃথক পৃথক। যাহার যে লোবটী যত বড়, তাহার সেই প্রবৃত্তি তত বেশী। আবার যাহার যে লোব যত ছোট, তাহার সেই প্রবৃত্তি তত অল্প বা কম। মনের প্রত্যেক বৃত্তিগুলির "লোব"গুলিও পৃথক পৃথক। সেই "লোব"গুলি দেখিয়া মানবের প্রত্যেকের প্রবৃত্তি বলা যায়। তাহার স্বভাব বলা যায়। ইহাকে ফ্রেনো-লজি (phrenlogy) কহে। ইহার সহিত সংযোগদ্বারা যে মেস্‌মেরিক্‌ ক্রিয়া উৎপন্ন করা যায়; তাহাকে ফ্রেনো-মেস্‌মেরিক্‌ বিষয় কহে।

১৩। সাধক ইচ্ছা করিলে পাত্রকে, উদ্ধত, বিনীত, সুখী, দুঃখী, বিরক্ত, সন্তুষ্ট, যা ইচ্ছা করিতে পারেন। যে কোন কাজ করাইতে পারেন। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, যাহা ইচ্ছা করাইতে পারেন।

পঞ্চমপরিচ্ছেদ।

১। ক্রিয়াপাত্র ঠিক নিজের স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করে। কখনই মিথ্যা কথা বলে না। যা জিজ্ঞাসা করা যায়, সব সত্য কথা বলে এবং যাহা তাহার স্থির নিশ্চয় জানা নাই, কিম্বা যাহাতে সন্দেহ আছে, তাহা সে বলিতে চাহে না। আমি জানি না, বুঝিতে পারিতেছিনা, দেখিতে পাইতেছি না; তা কেমন করিয়া বলিব, বলে। আর যাহা জানে, তাহা ঠিক ঠাক্ বলে।

নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট গান বাজনা করিলে সেই গানের ভাবানুযায়ী ভাব প্রকাশ করে। ভক্তি রসাত্মক গান করিলে ভক্তিতে বিভোর হইয়া যায় ও প্রার্থনা করে। খেমটা বাজাইলে নাচিতে থাকে। এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে

গীত, বাদ্য ও সুর আলোচনা এবং ধূপ, ধূনা, দীপাদি সুগন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার আছে। ঈশ্বরে তন্ময় হইবার সময় এ সকলের সাহায্য পাওয়া যায়।

ক্রিয়া সাধকের, প্রথম ক্রিয়াপাত্রকে আয়ত্তাধীনে আনিতে যতটা চেষ্টা, যত্ন, একাগ্রতা ও সময়ের দরকার হয়; দুচারিবার করার পর সে পাত্র তাঁহার অতি সহজ সাধ্য হয়। এমন কি যাহাকে প্রথমে নিদ্রিতাবস্থায় আনিতে একঘণ্টা লাগিয়াছে; পরে দু'এক মিনিটেই সেই কার্য্য সাধিত হয়। অনেক সময় প্রথম প্রথম নিস্ফল হইতে হয়, কিন্তু তজ্জন্য ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নয়।

যে সকল ক্রিয়া-পাত্র অতি ধীরে ধীরে অভিভূত হয়, তাহারা অতি সুপাত্র। তাহারা অতি উচ্চ অভিভাব্য হয়।

আবার দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত অন্তর্নিহিত বৈষম্য থাকিলে, একজন অন্যকে সহজে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিতে পারে। যেমন নীরস শুষ্ক প্রকৃতিগত ব্যক্তি, সরল কোমল প্রকৃতি ব্যক্তিকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে।

বিপুল মস্তিষ্ক ও উদ্যমশীল ক্রিয়াসাধক উৎকৃষ্ট ও অনুকুল লক্ষণযুক্ত। আর ক্রিয়া পাত্র যদি তেজস্বী ও উদ্যমশীল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়; তাহা হইলে তাহাকে মন সদাই

ক্রিয়াশীল থাকায় মেস্‌মেরাইজ্‌ হওয়ার প্রতিকুলে না হইলেও সহজে মেস্‌মেরাইজ্‌ হইতে চাহে না, কারণ তাহার মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি নানা চিন্তায় চিন্তিত থাকায় মেস্‌-মেরাইজ্‌ হইবার একাগ্রতা হওয়ার প্রতি বাধা দেয় বা বাধা পায়। মেস্‌মেরাইজ্‌ হইবার জন্য একাগ্রতা থাকিলে ক্রিয়া সাধকের সহায়তা হয়। যাহার মেস্‌মেরাইজ্‌ হইবার ইচ্ছা যতটা বেশী থাকে, সে তত শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া থাকে। যাহার যত কম তাহার তত বিলম্ব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেককে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট। তবে কম আর বেশী, এই মাত্র প্রভেদ।

২। বিনা চেষ্টাতেও আমরা পরস্পর পরস্পরকে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিয়া থাকি ও হইয়া থাকি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের শরীরস্থ তেজঃ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিশেষতঃ অঙ্গুলি ও ওষ্ঠ দিয়া বেশী ও নিয়ত বাহির হইতেছে, তাহা নিকটস্থ ব্যক্তির শরীরে পড়িতেছে এবং পরস্পর মেস্‌মেরাইজ্‌ হইতেছে, হইতেছি ও করিতেছি। আমাদের সেই তেজঃ দ্বারা মনের চিন্তা সকল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

• আমাদের প্রত্যেক চিন্তার স্পন্দন (ভাইব্রেশন, vibretion) নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কার্য্যকারী

হইয়া থাকে। চিন্তার রূপ আছে, বর্ণ আছে এবং অন্যের উপর পড়িয়া তাহার উপর কার্য্য করিবার শক্তি আছে। প্রত্যেক চিন্তা আপন আপন স্বজাতীয় প্রকৃতি অনুযায়ী পদার্থ লইয়া নিজের প্রকৃতি গঠন করে। নীচ চিন্তাসকল, নীচ ও (ভূঃ ও ভুবঃ লোক) নিম্নস্তর হইতে নীচ উপাদান লইয়া গঠিত হয়। আর উচ্চ চিন্তা সকল তৎ ঊর্দ্ধ স্বর্লোক আদি উচ্চস্তর হইতে সূক্ষ্ম উপাদান লইয়া নিজের গঠন উৎপন্ন করে বা গঠিত হয়। আমাদের মত হীন লোক সকল, নীচ লোকের সংস্রবে থাকিলে অজ্ঞাতসারে, তাহাদের নীচ প্রবৃত্তির বা প্রকৃতির অধীন হইয়া, ক্রমে অজ্ঞাতসারে নীচ কার্য্যে প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে। কাজেই তখন নীচ ও কুকার্য্য করিতে থাকি। তাই নীচের সংসর্গ, একত্র শয়ন, একত্র বসন ও আহারের নিষেধ আছে।

সেই সব চিন্তা অন্য ব্যক্তির উপর পতিত হইয়া স্বজাতীয় চিন্তার বল বৃদ্ধি করিতে পারে। নীচ লোকের নীচ চিন্তা সকল অন্যের উপর পড়িয়া অজ্ঞাতসারে নীচাশয় করিয়া দিতে পারে। তদ্রূপ উচ্চ ব্যক্তির উচ্চ চিন্তার স্পন্দনে উচ্চ ও সৎ ব্যক্তির উচ্চ ও সৎ চিন্তার বল বৃদ্ধি করে।

৩। কিন্তু উচ্চ ব্যক্তির উচ্চ চিন্তা থাকায়, নীচ ব্যক্তির নীচ চিন্তার স্পন্দন, তাঁহার উচ্চ চিন্তার স্পন্দনে পড়িয়া স্থান পায় না বা তাঁহাকে ভাইব্রেট্ বা স্পন্দিত করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সেই সকল খুব উচ্চ ব্যক্তির হস্তস্থিত ধূলা বা ভস্মও ঔষধের কার্য্য করে। যখন ইচ্ছা শক্তিযুক্ত হস্তস্থিত তেজঃ ভস্ম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারে, তখন তোমার বিজ্ঞানসম্মত রোগ আরোগ্যকারী ঔষধে, সেই শক্তি নিয়োজিত করিতে পারিলে সেই ঔষধ তীব্র ক্রিয়াশীল বা অমৃততুল্য না হইবে কেন? আবার ঔষধ যখন স্নায়ুমণ্ডল দিয়া বাহিত হইয়া জীবনীশক্তি বা রোগ আরোগ্যকারিণী শক্তির সাহায্যে রোগ আরোগ্য করে, তখন রোগীতে ক্রস্-ম্যাগ্‌নেটীক্ বাহিত করিলে স্নায়ুমণ্ডল বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন হওয়ায় ঔষধ তাহাতে কাজ করিতে অক্ষম না হইবে কেন? এক্ষণে আমি যখন মূল বিষয় ছাড়িয়া একটু অন্য পথে এসেছি। তখন আরও কিছু বলিয়া আবার মূল বিষয়ের আলোচনা করিব।

রোগ আরোগ্য করিতে নিদ্রা আনয়ন পর্য্যন্ত প্রায় প্রয়োজন হয় না। তবে সময় সময় বা অস্ত্র চিকিৎসার জন্য হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নিদ্রা আনয়নের

পূর্ব্বেও অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা দেখাইতে পারা যায়। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, দৃঢ় সংকল্প এবং তাহাতে আনন্দ, সরলতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী থাকা ক্রিয়া সাধকের প্রবল সহায় ও মস্ত গুণ।

যদি ক্রিয়াসাধকের এই বিষয়ে কোন স্বার্থ থাকে, তবে কার্য্য সুশৃঙ্খলে হয় না বা তাঁহার নিজের বিপদাশঙ্কাও অসম্ভব নহে। মেস্‌মেরিক্ ক্রিয়ায় অনাসক্ত ভাব হওয়া অতীব দরকার, অর্থাৎ স্বার্থত্যাগী হইয়া পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। এইজন্য এ বিষয় অতি গোপনীয়। এমন কি নিজের একটু বাহাদুরী দেখানর ইচ্ছা পর্য্যন্ত না থাকে। কোন প্রকার স্বার্থের বশীভূত হইয়া এ কার্য্যে নিযুক্ত বা রত হইবেন না।

৪। এস্থলে একটা প্রকৃত ঘটনা প্রমাণস্বরূপ বলিতে বাধ্য হইলাম। কলিকাতা বৃন্দাবন বসাকের গলিতে একজন বড় দরের ডাক্তার ছিলেন। তিনি এলোপ্যাথ্ হইলেও হোমিওপ্যাথ্ হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই ঔষধ দিতেন না। রোগীতে নিজের শরীরস্থ তেজঃ (পাশ) দিয়া রোগ আরোগ্য করিতেন, তাঁহার সুখ্যাতিতে হৈঃ হৈঃ রৈঃ রৈঃ পড়িয়া গেল। ডাক্তার বাবুর হাতে গেলেই রোগ মুক্ত। আশ্চর্য্য ব্যাপার ও আনন্দের বিষয়ও বটে, কিন্তু ইহার

ভিতর তাঁহার স্বার্থ ছিল, আট টাকা ভিজিট লইতেন। হঠাৎ একদিন হাঁটুতে খট্ করে লাগ্‌লো। ক্রমে বেদনা অসহ্য। জ্বর হলো। চারি মাস শয্যাগত। একদিন বেলা ৯টার সময় তিন জন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার খোঁজ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। হাঁটু ভাল হইল, কিন্তু চারি মাস পা গুটান থাকায় এ্যাঙ্কিলোসিস্ হইয়া চির দিনের জন্য একটু খোঁড়া হইলেন। তারপর এ প্রণালী ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথ্ হইলেন। তারপর হইতে যদিও কোন রোগীতে পাশ দিতেন; নিঃস্বার্থভাবে। তাঁহার রোগী আরোগ্যের প্রতি তাকাইয়া আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইতাম।

৫। আমি যেন ঠিক পথ ছাড়িয়া বিপথে যাইতেছি, মনে হয়; কিন্তু সংস্রব একেবারে তফাৎ হয় নাই।

এইরূপ অসংখ্য বা সমস্ত লোকের একই চিন্তার দ্বারা দেশের স্থূল সূক্ষ্ম সকল পদার্থের উপর পতিত হইয়া কাল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহাতে রাজধর্ম্মের দরকার হয়।

৬। সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ **রাজধর্ম্ম**। রাজধর্ম্ম দ্বারা শাসিত হইয়া সকল ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে, সুতরাং রাজা ভক্তির পাত্র। **রাজা ঈশ্বর সদৃশ।**

ভগবান গীতার ১০ম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে নিজমুখে বলিয়াছেন—

নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।

মানবের মধ্যে রাজা আমি। আবার ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিং।

সুতরাং রাজাই ভক্তির পাত্র ও পূজ্য। কাজেই রাজদ্রোহি, ঈশ্বরদ্রোহি। রাজাই যখন ঈশ্বরের তুল্য, তিনিই সকলের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

মনে করুন—রাজা যদি সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, সনাতন ধর্ম্মাক্রান্ত হন; সত্য, সরলতা, দয়া, স্নেহ, দণ্ডধারী ইত্যাদি সৎগুণ সম্পন্ন, সৎগুণে অলঙ্কৃত হন, তবে প্রজাও সৎগুণে বিভূষিত হইবে। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতর, পরধন হরণ, প্রতারণা, মিথ্যা, ইত্যাদি কোন কুকর্ম্মের চিন্তা মাত্র, কাহারও না থাকে; তবে রাজাও সুস্থির, নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারেন, আর দুষ্ট লোক না থাকায় পুলিশের দরকার হয় না, বিচারকের দরকার হয় না। বিচারের দরকার নাই, জেলখানারও দরকার নাই। সকলেই সৎবুদ্ধি সম্পন্ন।

দস্যু নাই, ভয় নাই, সকলেই সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,

সুতরাং এই যে সময় তাহাকে কি বলিব? **সত্য-যুগ।**

আবার যখন রাজা ও প্রজার হৃদয়ে চতুর্থাংশ অধর্ম্ম এলো, তখন—**ত্রেতাযুগ।** কাজেই অল্পস্বল্প বিচারের দরকার হলো, বিচারকের দরকার হলো, কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী সত্যবাদী, সুতরাং বিচারকার্য্য দুরূহ নয় বা অতি সহজ।

আবার যখন রাজা প্রজার হৃদয়ে অর্দ্ধেক পাপ এলো, তখন—সুতরাং **দ্বাপর।** তখন বিচারকার্য্য দুরূহ, কঠিন, জটিল হলো। বিচারকগণ সুবিচারের জন্য হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। সময় সময় অবিচারও দু-একটা হতে লাগ্‌লো। তারপর যখন লোকের ও রাজার মনে তিনভাগ পাপ ও একভাগ মাত্র ক্ষীণ ধর্ম্মের সঞ্চার হলো, তখনই—**কলি-কাল।** তখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বিচারক ও পুলিশ; ইত্যাদিতেও অবিচার। সুবিচারের আশামাত্র নাই। যার যত লোকবল, অর্থবল, বিচার তাহারই, তারই জয়। জেলখানায় লোক পরিপূর্ণ, স্থানাভাব সুতরাং রাজা পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং রাজা ও প্রজার মনঃবৃত্তির উপর কাল নির্ভর করে। লোকের মনঃবৃত্তির ইতর বিশেষে কাল মহাত্ম উৎপন্ন হয়; না বলিব কেন?

মানবের মনঃবৃত্তির স্পন্দন দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং সেই স্থূলের (ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ ও আকাশ) তন্মাত্র সকল (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ) সমস্ত তেজস্ততঃ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ইহা হাড়ে হাড়ে সত্য।

৭। যতপ্রকার বস্তু দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে, এক মানবে তাহার সমস্ত দ্রব্যের কিছু না কিছু আছে; তাই মানব এত উচ্চ। মানব কত উচ্চ হইতে পারে, তাহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে আসে না,—তাই মানবমণ্ডলীকে নমস্কার করি।

সেই মানব হইতে কি কার্য্য সাধিত না হইতে পারে? যদি আমরা যে কোন বিষয়ের একটা চিন্তা লইয়া তীব্র আন্দোলনের শেষ সীমায় অর্থাৎ একাগ্রতায় উপস্থিত হইতে পারি; তবে তৎকালে, ঠিক সেই সময়ে দূর দূরান্তরে কোন ব্যক্তি সেই চিন্তার অনুরূপ, ঠিক সেইরূপ চিন্তাস্রোত উৎপন্ন করিয়া যদি তাহাতে ভাসমান হয়; তবে ঐ পরস্পর চিন্তিত ব্যক্তির চিন্তা পরস্পরের সাহায্য করে। মনে করুন, ভারতে বসিয়া কোন ব্যক্তি কোন চিন্তার একাগ্রতা উৎপন্ন করিয়াছেন, বা করিতে দৃঢ়তর চেষ্টা করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে একজন বিলাতে বসিয়া সেই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া

দৃঢ়তর যত্ন করিতেছেন; তখন সেই চিন্তাস্রোত তেজস্তত্তঃ (ইথার) দ্বারা চালিত হইয়া উভয়ের মনে প্রতিফলিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে অর্থাৎ মনের ভাব উভয়ের মনে উদয় বা প্রতিফলিত হয়।

ঐ তেজস্তত্তঃ সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিতে পারে না। পৃথিবীর নিম্নস্তরে ততটা নির্ম্মল নহে, যতটা নির্ম্মল উপরে। পৃথিবীতে মানবের নানাপ্রকার চিন্তার স্রোত দ্বারা কলুষিত বা বর্ণশঙ্করতা উপস্থিত হওয়ায় সেই উভয় চিন্তিত ব্যক্তির সঙ্গে সহজে, শীঘ্র বা সরল ভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পায় না, একটু বিলম্ব হয়, কিন্তু উঁহারা যদি কিছু উচ্চ স্তরে বসেন বা থাকেন, তবে অতি শীঘ্র, সহজে বা সরল ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন হয়। সহজে ও শীঘ্র পরস্পরের নিকট হইতে পরস্পরের চিন্তার স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে থাকেন।

কোন কোন সভার সভ্যদের এমন নিয়ম আছে যে, একই সময়ে সকলে (যিনি যেখানে থাকুন) একই বিষয় পাঠ করিবেন, কারণ পরস্পর পরস্পরের ভাব সংগ্রহ হইবে, মনের ভাব প্রতিফলিত হওয়ায় বোধের সুবিধা হইবে।

পাঠক মহাশয় সকলেই জ্ঞাত আছেন; দূর দূরান্তরের কথা বা গান বাজনা শুনিবার জন্য আজকাল রেডিয়ম যন্ত্র

বাহির হইয়াছে, তাহাতে শব্দের ভাইব্রেশন লইবার জন্য একটী তার কিছু উর্দ্ধে রাখিতে হয়।

রেডিয়ম্ একটা পাড়াগ্রামে রাখিয়া ঘরে বসিয়া কলিকাতার থিয়েটার শোন। ইহাও ঐ (ইথর) তেজস্তত্ত্বঃ দ্বারা চালিত হয়।

৮। এক্ষণে এসো, আমরা সকলে মিলিয়া ঐ অলৌকিক ম্যাগনেটীক্ শক্তিকে এবং যিনি দিয়াছেন, তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি।

এই শক্তিকে আমরা মনের একাগ্রতা সহকারে বিপন্ন পীড়িতের উপর পরিচালিত করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া আনন্দিত হইতে পারি। আবার ইহার উপর সুনির্ব্বাচিত ঔষধের প্রাক্রিয়াকে ঐ শক্তি দানে আরও সুগম করিতে পারি।

যদি গৃহস্থের অসদ্ব্যবহারে বা নিজের স্বার্থের হানিতে রোগীর উপর বিরক্ত হই, তাহা হইলে আর সে রোগী ভাল করা যাইবে না। ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা রোগী ক্রস্ হইতে থাকে। তবে তাহার সেই জীবনীশক্তি এবং স্নায়ুমণ্ডল বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন হওয়ায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে না পারায় বিপথে পতিত হইয়া উপযুক্ত কার্য্যে

অক্ষম হইবে। সেরূপ স্থলে তাঁহার অপেক্ষা তীব্র ইচ্ছা-শক্তি চালক (পজেটীভ্) চিকিৎসক ভাল করিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতায় কুলাইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যদি কাহারও সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দৃঢ়তার সহিত আন্তরিক মঙ্গলচিন্তা করা যায় এবং তাকাইয়া দেখা যায়, তবে অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ ব্যক্তির ধীরে ধীরে মঙ্গল হইতেছে, যে সকল বিষয়ে তাহার বিশৃঙ্খলা ছিল, সেই সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা হইতেছে, যাহা জটিল ছিল, তাহা সরল হইতেছে ; যাহা দুর্গম ছিল, তাহা সুগম হইতেছে ; যাহাতে ক্ষতি হইতেছিল, তাহাতে লাভ হইতেছে। আবার আরও দেখা যায়, তৎসঙ্গে নিজেরও মঙ্গল হইতেছে, হৃদয় সরস, আনন্দময় হইতেছে। আবার তদ্বিপরীতে যদি কাহারও নিয়ত অমঙ্গল চিন্তা করা যায়, তবে তাহাকে সদাই বিপন্ন হইতে, তাহার লোকশান হইতে, তাহার সুশৃঙ্খলা বিষয় বিশৃঙ্খলাতে পরিণত হইতে, তাহার

সংসারে অশান্তি ও কলহ হইতে এবং আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইতে, দেখা যায়। নিজেরও তৎ সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসুবিধা এবং মনকষ্ট আসিতে থাকে। এ সকল বিষয় বিশেষ অনুধাবন না করিলে বুঝিতে পারা যায় না বা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা যতই উন্নতির পথে যাইতে থাকি ; এই ক্ষমতাগুলি ততই আমাদের বাড়ীতে থাকে।

অনেকেই জ্ঞাত আছেন—যিনি যে জন্তুদের হিংসা করেন, সেই সকল জন্তু তাঁহাকে ডরায় এবং তাহারাও হিংসা করে। যাঁহাদের হিংসাপ্রবৃত্তি নাই বা অতি কম, তাঁহাদের জীবজন্তু ডরায় না, বরং ভাল বাসে। অনেক স্ত্রীলোকের হিংসাপ্রবৃত্তি কম। দেখা যায়, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট বাসনাদি পরিষ্কার করিবার জন্য পুকুরে লইয়া যাইবার সময়, কাক অথবা শালিক তাঁহার সেই বাসনের উপর নির্ভয়ে বসিয়া খাদ্য খাইতে খাইতে যাইতে থাকে ; আমি দেখিয়াছি, তিনি তাড়াইলেও সহজে উড়িয়া যায় না কিম্বা একটু উড়িয়াই আবার সেই বাসনে বসে। আবার তদ্বিপরীতে দেখা যায়, যাহারা যে জন্তুর হিংসা করে, তাহারা কোন গ্রামে যাইলে সেই সকল জন্তু সে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করে কিম্বা তাহাদের হিংসা করে। এইজন্য একটা

প্রচলিত কথা আছে, "ভূতের রোজা ভূতের হাতেই মরে," "সাপের রোজা সর্পাঘাতেই মরে"। আমি দেখিয়াছি, কোন গ্রামে অসংখ্য বানর ছিল, হঠাৎ সমস্ত বানর গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্ন গ্রামে চলিয়া গেল, পরে জানা গেল, কয়েকজন বানর মাংসভোজী সাঁওতাল জাতিকে বাবুরা আনিয়া গ্রামে বাস করাইয়াছেন। তাই তারা পলাইয়াছে কিন্তু উহারা তাহাদের মারে নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, জীব জন্তুদের উপর মানবের ইচ্ছাশক্তি প্রবলরূপে কার্য্য করে কিম্বা জীবের ঐ অনুভূতি মানব অপেক্ষাও বেশী। অনেকে জানেন, মানবজাতি অপেক্ষা নীচ জীবের সাধারণ জ্ঞান বেশী। মানব পীড়িত হইলে চিকিৎসকের নিকট যাইয়া ঔষধ চাহিতে হয়, কিন্তু নীচ জীবের পীড়া হইলে তাহারা বনে প্রবিষ্ট হইয়া ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে নিজের আরোগ্যকারী ঔষধ খুঁজিয়া লইতে পারে বা লইয়া থাকে এবং তাহা খাইয়া আরোগ্য হয়। এই ক্ষমতা মানবের নাই বা অতি কম, কিম্বা কম লোকের আছে। যাহাদের আছে, তাহাও অতি অল্প বা সন্দেহযুক্ত, কিন্তু জীবের কম নহে; সন্দেহ মাত্র নাই। এ সকলও ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত নহে। জীবেরও ইচ্ছাশক্তি আছে, কিন্তু তাহারা সুনিয়মে পরিচালিত করিতে জানে না, অথচ তাহাদের ঐ শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ নহে।

মেস্‌মেরিক্‌ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। রোগের সম্বন্ধেও যে না বলিয়াছি, তাহা নহে। আর কিছু বলিব।

১। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই মেস্‌মেরিক, আমাদের ইচ্ছাশক্তি বা উইল পাউয়ার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ইচ্ছাশক্তি চালিত করিতে অভ্যাস করিতে হয়। মনের যতই একাগ্রতা অভ্যাস করিতে পারা যায়; মনকে যতই সংযত করিতে পারা যায়, মনের সংযমতা যতই অভ্যাস করা যায়, কার্য্য ততই সুগম ও সহজ হয়।

২। কার্য্যকালে বা অন্যান্য সময় মনকে এমন করিয়া গঠিত করিতে হয়, যেন কখনই পরের মঙ্গল চিন্তা ভিন্ন অমঙ্গল চিন্তা মনমধ্যে স্থান না পায়। ইহা অভ্যাস জন্য সদাই কুচিন্তা প্রত্যাহার পূর্ব্বক মঙ্গলচিন্তাকে দৃঢ়রূপে মনে আবদ্ধ করিতে হয়। মন যতই পরের মঙ্গল চিন্তায় কাল কাটাইতে পারে, ততই কার্য্যপটু ও দৃঢ় হয়।

রোগীর রোগ আরোগ্যের দৃঢ়তর চিন্তা কায়মনবাক্যে সদাই জাগরূক থাকা চাই। "সারে সারুক" করিলে হইবে না। "নিশ্চয়ই সারিবে" এই অকৃত্রিম, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাব থাকা চাই এবং নিজের উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। প্রত্যুপকারের আশা বা স্বার্থের লেশ

মাত্র ভিতরে না থাকে ও মনের দৃঢ় একাগ্রতা থাকাও দরকার। নিজের ক্ষমতার উপর সন্দেহ থাকিলে একাগ্রতা ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সুতরাং নিজের উপর সন্দেহ মাত্র না থাকে।

এই মেস্‌মেরিক্ ও ইচ্ছাশক্তি একই জিনিষ, কিছু মাত্র ভিন্ন নহে। কেবল প্রক্রিয়া মাত্র ভিন্ন। ভিতরের জিনিষটা একই। তফাতের মধ্যে কখন কখন দেখা যায়, মেস্‌মেরাইজ্ করিতে কাহারও কাহারও কখন কখন ক্লান্তি বোধ হয়, কিন্তু আরোগ্য করিবার জন্য যে রোগীর মঙ্গল কামনা ও ইচ্ছাশক্তি, যদ্বারা রোগী আরোগ্যের পথে দ্রুতঃবেগে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহাতে কখনই কোন ক্লান্তি আসে না, বরং আনন্দের স্রোতে হৃদয় প্রফুল্ল হওয়ায় আভ্যন্তরিক বল ও সুখ সঞ্চার হওয়ায় নিজেকে সুখময় করিয়া তোলে।

৩। ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে চিকিৎসাই হউক না কেন, ঈশ্বরদত্ত রোগ-আরোগ্যকারিণী শক্তি রোগ আরোগ্য করে। অন্য যে কোন উপায় বা যে কোন চিকিৎসা সমস্তই সেই অলৌকিক শক্তির সাহায্য করে মাত্র। মেস্‌মেরিক্ আরোগ্যও সেই শক্তির সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যে রোগীর এই শক্তির অত্যন্ত হীনাবস্থা বা

ক্ষীণাবস্থা কিম্বা চিকিৎসকের উইল পাউয়ার (ইচ্ছাশক্তি) বা আরোগ্য বিষয়ে সাধক দৃঢ় ভরসাযুক্ত নহেন, সন্দেহ-যুক্ত; সেইখানেই আরোগ্য হইতে বিলম্ব হয় কিম্বা আরোগ্যান্তে তাহা স্থায়ী হয় না, রিলাপ্স হয়; নতুবা কখনই পুনঃ পীড়িত হইবার কথা নহে।

১। রোগীকে কেবল মাত্র শক্তি চালনা দ্বারা আরোগ্য করা যায়।

২। সুনির্ব্বাচিত ঔষধ সহ এই শক্তিযোগ বা ইচ্ছাশক্তি চালনা দ্বারাও আরোগ্য করা যায়। এই দুই প্রণালী অবলম্বন দ্বারা আরোগ্যক্রিয়া আনিতে কতকগুলি নিয়মের অধীন হইতে হয়, সেগুলি চিকিৎসককে অগ্রে স্থির করিয়া লইতে হয়। অন্যথায় সময় সময় কিছু না কিছু গোলযোগে পড়িতে হয়।

১। কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য এ কার্য্যে হাত দিবেন না।

২। অর্থোপার্জ্জনের বাসনা না থাকে।

৩। বাহাদুরী দেখান কিম্বা নিজের প্রতিপত্তি লাভের কামনাও না থাকে।

৪। যাহারা এ বিষয়ে অবিশ্বাসী, তাহাদের

বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, ইহাতে কখনই হাত দিবেন না।

৫। দরকার হইলে অনেক দিন নিয়মিতরূপে চিকিৎসা চালাইতে পারিবেন কি না দেখিবেন, না পারিলে হাত দিবেন না।

৬। চিকিৎসাকালে রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজন দ্বারা কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারা সম্ভব কি না. ইহা বিবেচ্য। যদি কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে; তবে হাত না দেওয়াই ভাল।

৭। তাঁহার নিজের, সেই রোগীর উপর কোন প্রকার ঘৃণার ভাব, অনিচ্ছার ভাব বা তাহার উপর বিরক্তির ভাব আছে কি না। যদি থাকে, তবে হাত দিবেন না। তাহার উপর স্নেহ ও ভালবাসা থাকিলে বড়ই সুবিধা হয়।

৮। রোগীর উপর তাঁহার বিশেষ অনুকম্পা, দয়া, স্নেহ, মমতার ভাব ভালবাসা আছে কি না, থাকিলে বড়ই সুবিধা হয়।

৯। তাহাকে রোগমুক্ত করিবার সম্পূর্ণ

ইচ্ছা ও ভরসা আছে কি না? না থাকে, হাত দিবেন না।

১০। রোগীকে আরোগ্য করা ভিন্ন অন্য আর কোন অভিসন্ধি বা মতলব না থাকে।

১১। নিজের যতই ক্ষতি হউক, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিবেন না।

১২। আন্তরিক আনন্দসহ স্বীকার করিবেন।

১৩। মাতা, ভগনি, স্ত্রী ও কন্যা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোককে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিবেন না।

১৪। ক্রিয়া পাত্রকে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া কোন অন্যায়, অসঙ্গত আদেশ করিবেন না।

১৫। ক্রিয়া পাত্রকে নিজের সন্তানবৎ জ্ঞান করিবেন। তাহার মঙ্গলার্থে কায়মনবাক্যে মঙ্গল কামনা করিবেন।

এই সব বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই সব যতই অভ্যাস করিতে থাকিবেন, যতই পরের মঙ্গল কামনায় হৃদয় গঠিত হইতে থাকিবে, ততই আপনাআপনি ঊর্দ্ধস্তর হইতে সাহায্য ও বল পাইতে থাকিবেন। নিম্নস্তরে যতই মঙ্গল কামনা ছড়াইয়া দিতে পারিবেন বা দিতে

থাকিবেন। উপর হইতে জলের ট্যাঙ্কের ডলবের মত ততই নিজে বল পাইবেন। ততই মজবুৎ হইতে থাকিবেন। যখনই পরের অমঙ্গল চিন্তা আসিবে, তখনই নিজের অনিষ্ট হইতে থাকিবে। নিজের বলও কমিয়া যাইবে।

এক্ষণে আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহাও ম্যাগ্‌নেটীক শক্তির চালনা এবং মানসিক চিন্তাস্রোত চালনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই দুই প্রকারেই রোগীর রোগ আরোগ্য করা যায়। আর অনিষ্ট চিন্তা দ্বারা রোগীর অনিষ্ট হয় এবং পরে তৎ প্রতিক্রিয়া দ্বারা নিজের অনিষ্ট সাধন হয়। সূর্য্য নিজ উত্তাপ দানে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, আবার সেই উত্তাপ সূর্য্যে ফিরিয়া গিয়া সূর্য্যকে স্বাভাবিক করিয়া দেয়, তদ্রূপ আমরা পরের অনিষ্ট চিন্তা করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমাদের অনিষ্ট কেন না হইবে? আর মঙ্গল চিন্তায় কেন মঙ্গল হইবে না?

এক্ষণে আর একটী কথা—রোগজশক্তি বা রোগজনক বিষ রোগী শরীরে কিরূপে প্রবিষ্ট হয় ও কিরূপেই বা বাহির হইয়া যায়। এইটী আমাদের জানা থাকা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

পাঠক মহাশয়গণ সকলেই জড় পদার্থের অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ ক্রিয়া জ্ঞাত আছেন। মনে

করুন, যদি একটা সূক্ষ্ম চর্ম্মের থলির মধ্যে লবণমিশ্রিত জল রাখিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া আবদ্ধ করা যায়, যাহাতে কোন প্রকারে বাহির হইতে না পারে এবং তদবস্থায় সেই থলি যদি কোন নির্ম্মল, বিশুদ্ধ জলের পাত্রে ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, বাহিরের পাত্রস্থ জলে লবণের অংশ মিশ্রিত হইয়া সেই জল লবণাক্ত হইয়াছে। ইহাকে **বহির্ব্বাহ ক্রিয়া** কহে। আর ইহার ঠিক বিপরীত ক্রিয়াকে **অন্তর্ব্বাহ ক্রিয়া** কহে।

এই প্রকারে রোগ-শক্তি বাহির হইতে ভিতরের দিকে নীত হইয়া থাকে এবং তদ্বিপরীতে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে নীত হয়, ইহাকে রোগের **অন্তর্ম্মুখীন** ও **বহির্ম্মুখীন** গতি কহে। রোগের বহির্ম্মুখীন অর্থাৎ রোগ ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসা, রোগীর মঙ্গল-দায়ক। আর রোগের অন্তর্ম্মুখীন অর্থাৎ বাহিরের রোগ ভিতর দিকে যাওয়া রোগীর অমঙ্গলজনক জানিতে হইবে।

আর একটী নিয়ম—যখন রোগ ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসে, তখন প্রায়ই **নিম্নগামী** হয়, আর যখন বাহির হইতে ভিতর দিকে যায়, তখনতাহাকে **ঊর্দ্ধ-গামী** দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ একটী কথা বলিতে হইল। কোন ভদ্রলোকের পৃষ্ঠ হইতে কোমর পর্য্যন্ত দাদ ছিল।

আমি তৎ চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তিনি এক বৎসর পরে আমার নিকট আসিয়া বক্ষঃ পরীক্ষা করিতে বলিলেন। বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, আমার বোধ হয় "**টিউবার্কুলোসিস্**"। তিনি তাহাতে সায় দিয়া কহিলেন—সিবিল্-সার্জ্জনও ইহাই বলিয়াছেন এবং চিকিৎসাও যথেষ্ট করিয়াছেন, পরে দার্জ্জিলিং বায়ু পরিবর্ত্তনেও গিয়াছিলাম, কিছুই হয় নাই।" হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসাতে কি কিছু হইবে? তখন আমি তাঁহাকে ভরসা দিয়া সেই দাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম কবিরাজী তৈল ব্যবহারে ভাল হইয়াছে ও তৎপরেই এই রোগের আবির্ভাব। দেখুন এইটী দাদের **অন্তর্ম্মুখীন** গতি। তখন **সলফার** ২০০ প্রয়োগে রোগী রোগ মুক্ত হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাদ প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার **টিউবার্কুলোসিসের বহির্ম্মুখীন** গতি বলিতে হইবে অর্থাৎ দাদ ভিতরে যাইয়া টিউর্কুলোসিস্ হইয়া রোগীকে বিপদগ্রস্থ করিয়াছিল, পরে আবার সেই টিউবার্কুলোসিস্ বাহিরে দাদ্‌রূপে আসিয়া রোগীকে বাঁচাইয়া দিল।

আমরা ঈশ্বরের নিকট রোগারোগ্য কারিণী শক্তি যাহা পাইয়াছি, যদ্দারা আমরা রোগমুক্ত হইয়া থাকি,

রোগশক্তির সহিত সেই আরোগ্যকারিণীশক্তির একটা ভীষণ সংঘর্ষণ হইতে থাকে। তাই রোগকালে অত যাতনা হইতে থাকে। সেই যাতনা ঐ উভয়ের প্রতিদ্বন্দিতার ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যখন সেই রোগ দ্বারা আরোগ্যকারিণী জীবনীশক্তির লোপ হয়, তখন আর তত যাতনা থাকে না ও তখন আরোগ্যের আশাও আর থাকে না, তখন ঔষধও ক্রিয়া হীন হইয়া যায় অর্থাৎ আরোগ্যকারিণী শক্তি না থাকায় ঔষধ কাহার দ্বারা ক্রিয়াশীল হইবে? কাজেই তখন মৃত্যু অবধারিত। যখন মৃত্যুই নিশ্চয়, তখন দেহ হইতে প্রাণ বায়ু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার সময় আবার নানা যাতনা হইতে থাকে। তাহা দেহ হইতে প্রাণ বায়ু পৃথক হইবার সংঘর্ষণের যাতনা। সে সকলের বর্ণনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর রোগ আরোগ্যকারিণী জীবনীশক্তির রোগ দূরীকরণের যে চেষ্টা, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনাপনি হইয়া থাকে। তাহাতে রোগীর নিজের ঐ জীবনীশক্তিকে রোগ আরোগ্য করাইবার জন্য জ্ঞান পূর্ব্বক কোন চেষ্টার দরকার হয় না। তবে এমন মহাত্মা জগতে আছেন, যিনি ঐ অনৈচ্ছিক শক্তিকে নিজের সাধনা দ্বারা ইচ্ছার অধীন করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে

নিজের ইচ্ছাধীনে আনিয়া তাহার স্ফুরণ দ্বারা রোগ শীঘ্র আরোগ্য করিয়া নীরোগ হইতে পারেন, কিম্বা তাহাকে বিকিরণ দ্বারা নিজের দেহ ত্যাগ করিতেও পারেন। আবার নিজের সেই জীবনীশক্তি যদি একেবারে ক্ষীণ হইয়া থাকে, তবে অন্যের নিকট হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ দেহকে সুস্থ ও নিরোগ করিতেও পারেন, কিন্তু নিজের জন্য করেন না। তবে জগতের মঙ্গলের জন্য এরূপ করা অসম্ভব নহে। আবার নিজের সেই শক্তি দানে মৃত্যুন্মুখ ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া দিতেও পারেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ অনন্তরাম ও মিরণের বিষয় প্রমাণ ও স্মরণ যোগ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একক্ষণে শক্তি চালনার বিষয় কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত জীবনীশক্তি বা রোগ আরোগ্য কারিণী স্বাভাবিকশক্তি আপনাপনি রোগ আরোগ্যকরণে স্বতঃই নিযুক্ত হয়; রোগীর সে বিষয়ে কোন ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু শক্তি চালক বা সাধকের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঐ জীবনী শক্তির কার্য্য হইতে পারে।

তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রণোদিত হইয়া রোগারোগ্য শক্তি তীব্রভাবে কার্য্য করিয়া রোগীকে সত্বর আরোগ্য পথে দ্রুত চালিত করিয়া আরোগ্য করিয়া দেয়। রোগ আরোগ্য-কারিণী জীবনী শক্তি রোগীর ইচ্ছার অধীন থাকে না, কিন্তু সাধকের ইচ্ছার অধীন থাকে।

ঔষধ যেমন রোগারোগ্যকারিণী জীবনী শক্তির উপর কার্য্য করিয়া রোগ আরোগ্য করে, তেমনি শক্তি চালকের ইচ্ছা শক্তি এবং মেস্‌মেরিক্‌ শক্তি (তেজঃ) ঐ আরোগ্যকারিণী জীবনী শক্তির চৈতন্য সম্পাদন করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়।

পাশগুলিকে মোটের উপর দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১ম। **শক্তি-প্রবর্ত্তক বা মেস্‌মেরাইজিং পাশ।**

২য়। **শক্তি-নিবর্ত্তক বা ডি-মেস্‌মেরাইজিং পাশ।**

শক্তি-প্রবর্ত্তক পাশের ঠিক বিপরীত ক্রিয়া, শক্তি-নিবর্ত্তক পাশ দ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং শক্তি-নিবর্ত্তক পাশ চিকিৎসার জন্য প্রায় ব্যবহার বা দরকার হয় না, অতএব নিবর্ত্তক পাশের বিশেষ বৃত্তান্ত প্রয়োজন নাই।

১। **লম্বা পাশ**।—উভয় হাত দ্বারা পাশ দিতে হয়; এক হাতেও দেওয়া যায়। হাত ও হাতের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ রোগীর অভিমুখে রাখিয়া উপর হইতে নীচের দিকে ধীরে ধীরে টানিয়া আনিতে থাকিবেন। তৎকালে রোগীর শরীর স্পর্শ করিবেন না। দুই হাত বেশী দূরবর্ত্তী না হয়। দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ উপরি উপরি চেরার মত রাখিয়া পাশ দিলে যেন কিছু সুবিধা হয়, তখন একটী অঙ্গুষ্ঠ দেখা যাইবে না এবং দুই হাতের তর্জ্জনিদ্বয়ও পরস্পর পাশাপাশি রাখিলে ভাল হয়। অঙ্গুলিগুলি সংযুক্ত বা সামান্য ছাড়া ছাড়া ভাবে রাখিতে হয়। তবে বেশী ফাঁক করা উচিত নয়। এইরূপে উপর হইতে শরীরের এক ইঞ্চ দূর দিয়া একাগ্র মনে হাত ধীরে ধীরে কোমর বা পা পর্য্যন্ত টানিয়া হাত মুষ্টিবদ্ধ করিবেন এবং তাহার শরীরের উপর দিয়া উর্দ্ধে লইয়া যাইবেন না। বক্রভাবে পার্শ্ব দিয়া মস্তকের উপর উঠাইয়া মুষ্টি খুলিয়া দুতিন বার **হাত ঝাড়িয়া** আবার পূর্ব্ববৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবেন। **হাত ঝাড়িয়া** ফেলা বিশেষ প্রয়োজনীয় জানিবেন। নিম্ন হইতে হাত ক্রিয়াপাত্রের উপর দিয়া লইয়া যাইলে, **নিবর্ত্তক পাশ** দেওয়া হইয়া যায়।

যেটুকু উপকার হইয়াছিল, সেটুকু নষ্ট হইয়া যায়। হাত ঝাড়িতে ভুলিয়া গেলে, রোগীর শরীরস্থ বেদনা বা রোগ বেশী হওয়াও অসম্ভব নহে, সুতরাং হাত ঝাড়িতে কখনই ভুলিবেন না। পাশ দিবার সময় পাত্রের গাত্র অনাবৃত রাখিবেন। কাপড়াদি দ্বারা আবৃত থাকিলে সুবিধা হয় না; কারণ কাপড় অপরিচালক জনিত হাতের তেজঃ, ক্রিয়া পাত্রের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাধা পায়, কিন্তু অনাবৃত রাখা সকল সময় ঘটে না, কারণ স্ত্রীলোক বা দুর্ব্বল ব্যক্তির অনাবৃত রাখা অসম্ভব হয়; সে স্থলে অতি পাতলা কাপড় দ্বারা আবৃত রাখিতে হয়; রেশমী কাপড় বা গরম প্রভৃতি অপরিচালক কাপড় গাত্রে থাকিলে রোগীর শরীরে, সেই করেণ্ট বা সেই স্রোত প্রবিষ্ট হইতে না পারায় মেস্‌মেরাইজ্‌ হইবে না। কাজেই পরিচালক কাপড় আবৃত রাখিতে হয়, কিন্তু সুতার কাপড়ও অপরিচালক; তবে পশম, গরদ অপেক্ষা কিছু অল্প।

২। **পাশাপাশী পাশ**।—ইহাতে পূর্ব্ববৎ করতলের দিক রোগীর দিকে রাখিয়া সাধকের ঊর্দ্ধ ও দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অধঃ ও বাম দিকে টানিয়া আনিতে হয়। অঙ্গুলিগুলি পূর্ব্ববৎ রাখিতে হইবে। নিম্ন ও বাম দিকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া পরে

হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পাত্রের গাত্রের তফাৎ দিয়া পূর্ব্বস্থানে লইয়া যাইয়া আবার পূর্ব্ববৎ টানিবেন। এই প্রকার পাশ বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ, উদর প্রভৃতি স্থানে দেওয়া যায়। অবশ্য স্মরণ রাখিবেন, অবশ্যই **ডানদিক** হইতে **বামদিকে** আনিবেন, কদাচ ভুল না হয়। যেন বাম হইতে ডান দিকে না আসে।

আবার যদি এই পাশ দূর পর্য্যন্ত দিতে হয়; তবে কদাচিৎ যেন নিম্ন হইতে উর্দ্ধে না আসে। **উর্দ্ধ** হইতে **নিম্নে** ও **ডান** হইতে **বামে** আনিবেন। হাত উঠাইবার সময় অবশ্য যেন মনে থাকে, **হাত ঝাড়িতে** হইবে, এবং মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পূর্ব্বস্থানে হাত শরীরের তফাৎ দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। প্রবর্ত্তক পাশ দিতে যেন নিবর্ত্তক পাশ দেওয়া না হইয়া যায়; ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

৩। **কুণ্ডলীপাশ**।—নিজের দক্ষিণ হস্তদ্বারা রোগীর পীড়িত অঙ্গের বাম পার্শ্বে কোন একটী বিন্দু কল্পনা করিয়া লইয়া, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের বাম দিক অভিমুখে বৃত্তাকারে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিজের হস্তের একহাত পরিমাণ ব্যাস এরূপ একটী বৃত্ত ঐ পীড়িত অঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক (শূন্যোপরি) অঙ্কিত করিয়া লইবেন।

পরে ঐ প্রণালীতে ক্রমশঃ ছোট, তারপর তদপেক্ষা ছোট; এইরূপ করিয়া এক একটী বৃত্ত টানিতে থাকিবেন, যতক্ষণ একটী বিন্দু মাত্রে পরিণত না হয়। যখন একটী বিন্দু হইয়া গেল, তখন সেই বিন্দু হইতে লম্বমান রজ্জুর ন্যায় সরল রেখা ঊর্দ্ধ হইতে অধঃমুখে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া পশ্চাৎ পূর্ব্বের মত হাত ঝাড়িয়া ফেলিবেন। শরীরের স্থানের তারতম্যানুসারে কুণ্ডলীপাশ অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে কিম্বা অগ্র পশ্চাৎ ভাবেও দিতে হয়। মস্তকের দিকে হইলে অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে যায় কিন্তু জঙ্ঘায় কিম্বা বাহুর সম্মুখে দিতে হইলে নিজের সম্মুখ হইতে ক্রমশঃ নিকটে আসিবে।

৪। হিজিবিজি পাশ।—যদি বক্ষঃস্থলে পাশ দিতে হয়। তবে প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের করতলকে মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ঐ স্থানের উপর স্থাপিত করিবেন। পরে কিছুক্ষণ ঐরূপ ভাবে রাখিয়া সহসা সরাইয়া লইয়া সত্বর নিজের দক্ষিণাভিমুখে, অধোদিকে ঈষৎ বক্রঃভাবে সরল রেখা ক্রমে সঞ্চালিত করতঃ, পরে আবার সেইখান হইতে নিজের বাম অভিমুখে ঐরূপ অধোদিকে ঈষৎ তির্য্যকভাবে সরলরেখা ক্রমে টানিয়া আনিতে হইবে, কিন্তু এই বারের রেখা পূর্ব্ব-কারের রেখা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কিছু কম বা ছোট হইবে।

কতকটা যেন Z মত হইবে। ইহার পর দক্ষিণাভিমুখে ঐরূপ করিবেন। তবে ক্রমেই রেখার দৈর্ঘ্যতা কমাইবেন এবং হস্ত নিম্নাভিমুখী হইতে থাকিবে। যথায় রেখা খুব ছোট হইয়া আসিবে, তথায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া লম্ব রেখা ক্রমে কিছু দূর পর্য্যন্ত মুষ্টিবদ্ধ হাতকে টানিয়া আনিয়া হাত ঝাড়িয়া ফেলিবেন।

৫। **ফ্রিকশন্ বা ঘর্ষণ পাশ।**—ইহা আলগাভাবে, লঘুভাবে কি জোরে স্পর্শ করিয়া এই দুই প্রকারেই দেওয়া যায়। এই দুইপ্রকার পাশ দিতে শরীর স্পর্শ করিতে হয়।

৬। **শ্বাস বায়ু চালনা দ্বারা পাশ দেওয়া।**—ইহাও আবার দুইপ্রকারে দেওয়া যায়। ক। উষ্ণ। খ। শীতল।

(ক) **উষ্ণ শ্বাস**—উষ্ণশ্বাস দ্বারা অনেক রোগের চিকিৎসা করা, যায়। উপকারও যথেষ্ট হয়। পীড়িত অঙ্গের উপর এক খণ্ড পরিষ্কার টুকরা বস্ত্র খণ্ড রাখিয়া, নাসিকার দ্বারা শ্বাস লইয়া এবং অল্প মুখ হাঁ করিয়া হাই দিবার মত গরম নিশ্বাস উহার উপর দিতে থাকিবেন। বায়ু প্রয়োগকালে মুখ দিয়া দিবেন, কিন্তু কদাচ মুখ দিয়া নিশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিবেন

না। নাক দিয়া গ্রহণ করিবেন। অনেক দিন অভ্যাস না করিলে উষ্ণশ্বাস চালনা বেশীক্ষণ করিতে পারা যায় না। উষ্ণশ্বাস অনেকক্ষণ করিতে না পারিলে কঠিন রোগী আরোগ্য করা যায় না। মৃতবৎ কঠিন রোগীতে এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা উষ্ণশ্বাস দিতে না পারিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব হইতে বিশেষ অভ্যাস না করিলে কার্য্যকালে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়; তখন আর সে কার্য্য হয় না।

(খ)—**শীতল শ্বাস**—শীতল পাশ আবার দুই প্রকার।

১ম।—যে কোন অল্প স্থানে ফুঁ দিতে হয়। ঠোঁট সরু করিয়া জিহ্বার অগ্রভাগ সরু করিয়া এবং জিহ্বার পিট দ্বারা দন্তগুলিকে চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নে ও দক্ষিণ হইতে বামে ক্রমশঃ ফুঁ দিতে হয়।

২য়।—করতল দ্বারা পাখা দিয়া বাতাস করার মত দেওয়া। অঙ্গুলিগুলি একটু তফাৎ ভাবে রাখিতে হয়।

(গ)—করতলের মূল রোগীর উপর রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ-বাদে আর আটটী অঙ্গুলীর সাহায্যে উপর হইতে চাপ দিয়া ক্রমশঃ নিম্নের দিকে নামাইয়া আনিতে হয়।

(ঘ)—উভয় অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মিলাইয়া অগ্রভাগের

উপর ভর দিয়া অপর চারিটী অঙ্গুলীর সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়।

(ঙ)—কেবল তর্জ্জনিদ্বয়ের উপর ভর দিয়া অগ্রসর হওয়া। ইহাদের লিডিং পাশ কহে।

(চ)—ষ্ট্রোকিং বা আঘাত করা।—তর্জ্জনি অঙ্গুলী দ্বারা ঘা দেওয়া। তর্জ্জনি, মধ্যমা, অনামিকা দ্বারা ঘা দেওয়া কিম্বা তর্জ্জনি, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা ঘা দেওয়া।

সাধক কার্য্যকালে নিজ শরীরস্থ ম্যাগ্‌নেটীক্-শক্তি (উষ্ণ শক্তি) অঙ্গুলি দ্বারা বাহিরের দিকে সঞ্চালিত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া রোগীর শরীরস্থ রোগারোগ্যকারিণী জীবনী শক্তির সাহায্যে তাহার রোগ সমূলে নির্ম্মূল করিব বা করিতেছি,এই কামনায় বিভোর থাকিয়া চালিত করিবেন।

(ঙ)—হাতের সমস্ত অঙ্গুলি একত্র করিয়া ঝাড়িয়াও দেওয়া যাইতে পারে।

এই সকল বাদে জলপড়া, তেলপড়া ইত্যাদি দেওয়াতে অনেক সময় কিছু কিছু উপকার পাওয়া যায়; তবে তাহা অতি কম পরিমাণে। জলপড়ার শক্তি অতি কম হইলেও অনেক সময় শিশুদের জ্বর কমান, বাহ্যে করান, নিদ্রা আয়তন প্রকৃতিতে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

(জ) **জল পড়িবার পদ্ধতি**।—বাম হাত চিৎ করিয়া তাহার উপর জলের পাত্রটী বসাইয়া পাঁচটী অঙ্গুলিই উচ্চ করিয়া পাত্রকে চাপিয়া ধরিবে। পাত্রের বাম পার্শ্বের কিনারায়, নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ রাখিয়া, অল্পক্ষণ পরে সরল রেখাভাবে পাত্রের দক্ষিণ কিনারায় আনিয়া, আবার অল্পক্ষণ রাখিবেন। আবার পার হইবার সময় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অতি সামান্য ভাবে জল স্পর্শ করিয়া যাইবেন। পাত্রের পার্শ্বদিয়া তলা পর্য্যন্ত যাইবেন। সেখানে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর বাহিরদিক দিয়া বৃত্তাকারে আবার বাম কিনারায় সেই পূর্ব্বস্থানে অঙ্গুষ্ঠ রাখিবেন। এইরূপ পাঁচ ছয় বার করিবেন, তারপর জলের উপর প্রক্ষেপ অর্থাৎ মুষ্টিবদ্ধহস্ত জলের উপরের নিকটে আনিয়া হঠাৎ খুলিয়া দিবেন,যেন নিজ তেজঃ জলে নিক্ষিপ্ত হইল। দুই চারি মিনিট এইরূপ করিতে হয়। বোতল বা সিসি হইলে তর্জ্জনি অঙ্গুলি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ঐ কার্য্য করিতে হয়, অথবা ফুঁ দিয়াও করা যাইতে পারে। নল হইলে ফুঁ দিবার বেশ সুবিধা হয়। তর্জ্জনি দ্বারা জলটা আলোড়িত করিয়া দিবেনও শেষে কুণ্ডলি পাশ দিয়া পাত্র আবৃত করিয়া দিবেন।

এইরূপে তৈলপড়া, জলপড়া, ফ্লানেল পড়া, সুবিধামত

দিতে হয়। ফ্লানেল পড়া বা তৈলপড়া জল পড়ার মতন। তৈল পড়াতে অনেক সময় সামান্য সামান্য ক্ষত, পোড়াক্ষত ছেঁচা আঘাত ও বেদনা, বাত আদি ভাল করা যায়। বোতল ও সিসিতে জল ম্যাগ্‌নেটাইজ্‌ করিতে কিছু অসুবিধা হয়। এই সকলের মধ্যে যে প্রকারই হউক না কেন; কার্য্য করিবার সময় সাধকের একাগ্রতাসহ নিজ শক্তি পরিচালিত করিতেছি এবং তৎসহ রোগীর মঙ্গলকামনার ইচ্ছা থাকা চাই। তৎকালে নিজের সাংসারিক অশান্তি জনিত মনস্তাপ, দুঃখ অথবা ক্রোধের লেশ মাত্র থাকিবে না। রোগীর মঙ্গলকামনায় আনন্দময় থাকিয়া তত্রস্থ বায়ুমণ্ডলকে পর্য্যন্ত আনন্দের হিল্লোলে স্পন্দিত করিতে থাকিবেন। যদি মনে ক্রূরতা, হিংসা বা পরের মঙ্গলের অনিচ্ছার বিন্দুমাত্র ভাব থাকে, তাহা হইলে কদাচ এ কার্য্যে হাত দিবেন না। তাহাতে পরের অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে, অজ্ঞাতসারে নিজেরও অমঙ্গল আসিয়া পড়িবে; সুতরাং যতক্ষণ নিজে উপযুক্ত হইতে না পারিবেন, যতক্ষণ নিজের মনে একটু কুভাব থাকিবে, যতক্ষণ মনে একটু মাত্র সন্দেহ থাকিবে; ততক্ষণ বা ততদিন কোন মতেই ইহাতে হাত দিবেন না।

এ কথা যে কেবল মেস্‌মেরিক্‌ চিকিৎসাতে বলিতেছি,

এমত নহে। ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে গেলেও অজ্ঞাতসারে মেস্‌মেরাইজ্‌ করা না হয়, এমন নহে। সকল স্থলেই রোগীর মঙ্গলকামনা রাখিয়া রোগীতে হাত দিতে হয়। অন্যথায় রোগীর অমঙ্গল সহ অজ্ঞাতসারে নিজের অমঙ্গল করিয়া ফেলিবেন, ইহার কোনমতে অন্যথা হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন, আমি যদি অপরের অনিষ্ট করি, তবে আমার কেন অনিষ্ট হইবে? কেহ জানিতে না পারিলেই হইল। সেটা মস্ত ভুল। যা করা যায়, তা নিজের জন্যই হয়। পরের জন্য মনে মনে যে সংকল্প করিবেন, যে বাণ প্রস্তুত করিবেন বা হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ বা কিছু বিলম্বে ফিরিয়া নিজের উপর কার্য্য করিয়া তবে নির্ব্বাণ হইবে। যতক্ষণ বা যতদিন তোমার চিন্তা তোমার উপর কার্য্য করিতে পারিবে না বা সময় পাইবে না; ততক্ষণ বা ততদিন তাহা গুপ্তভাবে শূন্যমার্গে জাজ্বল্যমান থাকিবে। ইহাকে সাধারণে **চিত্রগুপ্তের খাতা** কহে। **চিত্রগুপ্ত—গুপ্ত-চিত্র।** শূন্যমার্গে গুপ্তভাবে অদৃশ্যভাবে অঙ্কিত থাকে। চিন্তার যেমন ক্রিয়া আছে, তেমনি প্রতিক্রিয়াও আছে। ক্রিয়া প্রথমেই অন্যব্যক্তির উপর কাজ করে, আর প্রতিক্রিয়া নিজের উপর কার্য্য করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

(ঋ) **ফ্লানেল পড়া**।—একখণ্ড নূতন ফ্লানেল লইয়া তিন চারি ভাজ করিয়া নিজের বাম বগলে চারি পাঁচ মিনিট রাখিয়া, পরে দক্ষিণ বগলে চারি পাঁচ মিনিট রাখিয়া হস্ত-মুষ্টি মধ্যে কতকক্ষণ রাখিয়া ছাড়িয়া দিবেন।

(ঞ) **নুতন ষ্টকিন্**ও ম্যাগ্নেটাইজ করিয়া দেওয়া যায়।

কোন্ কোন্ পাশে কি কি রোগ আরোগ্য করা যায়, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম।

১। **ফ্লানেল পড়া**।—ফ্লানেল পড়াতে অনেক স্থানের বেদনা আরোগ্য হয়।

২। **জলপড়া**।—জলপড়াতে শিশুদের জ্বরের উত্তাপ কমান, নিদ্রা আনয়ন ও বাহ্যে করান যায়।

৩। **তৈলপড়া**।—তৈলপড়াতে সামান্য সামান্য ক্ষত আরোগ্য হয়। তেলের মধ্যে সরিষা বা তিলের তৈল প্রশস্ত।

৪। **কুণ্ডলী পাশ**।—মস্তকের ভারবোধ ও মস্তকের রক্তাধিক্য নিবারণ করা যায়।

৫। **হিলিবিলি পাশ**।—শ্বাস কষ্ট ও বুকের রক্তাধিক্য আরোগ্য হয়।

৬। **লম্বা পাশ**।—১। নিদ্রিত করা। ২। মস্তকের ভার ও রক্তাধিক্য নিবারণ করা। ৩। সর্ব্বাঙ্গের

বেদনা বা বাতরোগ নিরাময় করা। ৪। জ্বর। ৫। হিষ্টিরিয়া বা গুল্মবায়ু। ৬। আক্ষেপ বা কন্‌ভলশন্‌। ৭। শিশু দড়কা ৮। শিশুদের প্রবল জ্বর ইত্যাদি ভাল করা যায়।

৭। **পাশাপাশী পাশ**।—বুকে, পিঠে ও পেটের বেদনাতে দেওয়া যায়।

৮। **গাঢ় স্পর্শ পাশ**।—যে বেদনা টিপিলে উপশম হয়, বৃদ্ধি হয় না, লাগে না। অসাড় বা স্পর্শ বোধ রহিত, শোথ, ঝিন্‌ঝিন্‌ ধরা ইত্যাদি স্থানে দেওয়া যায়, এবং বিষাক্ত কীট দংশিত স্থানেও উপকার হয়।

৯। **লঘুস্পর্শ পাশ**।—স্নায়বীয় বেদনা, মাথাধরা, জ্বালা করা যাতনা ভাল হয়।

১০। **ঘা মারা পাশ**।—অবশতা, বাত বেদনা বিশেষতঃ পৃষ্ঠের উপর বাতের ব্যথা, মেরুদণ্ডের উপর পাশ দিয়া বাত ভাল হয়।

১১। **ময়দা ছানাবৎ পাশ**।—বাত ও জ্বরে গাত্র কামড়ান ইত্যাদি ভাল হয়।

১২। **উষ্ণ শ্বাস**।—মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ দান করা যায়। অত্যন্ত রক্তস্রাব আদি দ্বারা নির্জ্জীব রোগীকে সজীব করা যায়।

১৩। **শীতলশ্বাস পাশ**।—ইহাতে বেদনার

তীব্রতা কমাইয়া শান্তি দেওয়া যায়। দাহ নিবারণ ও স্নায়বীয় বেদনা হ্রাস করা যায়।

১৪। **করপত্র বীজন।**—কোন স্থানের উপদাহের উগ্রতা কমায়। উহাকে ছড়াইয়া দেওয়া যায় এবং যাতনা কমান যায়।

মেস্‌মেরাইজ্‌ করিতে শিখিতে শিখিতে, অভ্যাস করিতে করিতে, পরে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিতে করিতে আবার মেস্‌মেরাইজ্‌ করিবার অনেক উপায় আপনাপনি উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। তখন নিজের বড়ই আনন্দ হয়। যা হউক, নিদ্রিত করা তো হইল। আবার ক্রিয়াপাত্রের জ্ঞানও আপনাপনি হইয়া থাকে, তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু যদি ক্রিয়াপাত্রের নিদ্রা সহজে ভঙ্গ না হয়, তবে ক্রিয়া সাধককে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিতে হয়। সেটীও শিক্ষা করা উচিত।

সহজে নিদ্রাভঙ্গ না হইলে দু'তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিবেন। পরে **বিপরীত পাশ বা নিবর্ত্তক পাশ** দিতে হয়। মস্তক ও মুখমণ্ডলের উপর **শীতল শ্বাস্‌ পাশ** বা **করপত্র বীজন** করিলেই জ্ঞান হইয়া থাকে। কখন কখন ক্রিয়াপাত্র **তাকাইতে** পারে না। তখন সাধককে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বার নাকের

উপরদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া রগ পর্য্যন্ত ডলিয়া দিতে হয়। শেষে **করপত্র বীজন** বা ফুৎকার প্রদান দ্বারা সারিয়া যায়। সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে ছাড়িয়া আসিবেন না।

নিবর্ত্তক পাশের ক্রিয়া প্রবর্ত্তক পাশের বিপরীত সুতরাং যে ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহার সংহার করা বা নিবৃত্তি করা। প্রয়োগ করা শক্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করা।

প্রবর্ত্তক পাশ দিবার সময় নিজের করতল, ক্রিয়াপাত্রের দিকে থাকে, নিবর্ত্তক পাশ দিবার সময় করতল তাহার বিপরীতে করিতে হয়, অর্থাৎ হাতের পৃষ্ঠের দিক, ক্রিয়া-পাত্রের দিকে ফিরান থাকিবে! প্রবর্ত্তক পাশ উপর হইতে নীচের দিকে, এবং দক্ষিণ হইতে বামে আনিতে হয়, আর নিবর্ত্তক পাশ নীচ হইতে উপরে এবং বাম হইতে দক্ষিণে চালিত করিতে হইবে। ইচ্ছাশক্তি যেন জাগ্রত থাকে, ইহা সদাই স্মরণযোগ্য। প্রবর্ত্তক পাশ দিবার সময়ে যেমন প্রবর্ত্তমান ক্রিয়ার সাধন জন্য ইচ্ছাশক্তি থাকিবে, তেমনি নিবর্ত্তক পাশ দিবার সময়েও নিবৃত্তি সাধন জন্য ইচ্ছা প্রবল থাকা চাই। নিজের ইচ্ছাশক্তি জড়বৎ বা নিদ্রিতবৎ রাখিয়া প্রবর্ত্তক পাশ দেওয়া যেমন বৃথা,

তদ্রূপ ইচ্ছাশক্তিকে জড়ীভূত রাখিয়া নিবর্ত্তক পাশ দেওয়াও তেমনি বৃথা, সুতরাং সকল সময়েই সাধকের সফল কামযুক্ত ও মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং ধীর হওয়া দরকার। ব্যস্ত বাগীশ ব্যক্তির কার্য্য নহে।

যতক্ষণ রোগীর বেশ নিদ্রাভঙ্গ না হইবে; ততক্ষণ সাধক কখনই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। ভীত, চঞ্চল, ব্যস্ত, উত্তেজিত বা ক্রোধান্বিত হইবেন না। স্থির, ধীর, শান্ত ও আনন্দময় হইয়া তাহার কাছে বসিয়া থাকিবেন। কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলেই বিপদ। অভিজ্ঞ সাধক জানেন, কোন্ রোগীর নিকট কতক্ষণ থাকিতে হইবে। যতক্ষণ বা যতদিন সে সম্পূর্ণ সুস্থ বা জ্ঞান প্রাপ্ত না হয়; ততক্ষণ বা ততদিন তাহাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। ক্রিয়া সাধক অন্য কোন লোককে ক্রিয়া পাত্রকে স্পর্শ করিতে দিবেন না। কেবল নিজে স্পর্শ করিবেন মাত্র। কেন? ইহা তিনি অবশ্য জানেন, আমাদের পাঠক মহাশয়গণও জানেন যে, ক্রস্‌মেস্‌মেরাইজ্‌ হইয়া পড়িবে।

এমন পাত্রও দেখা যায় যে, বহু দিন চেষ্টা করিয়াও নিদ্রিত করা গেল না, হঠাৎ একদিন অল্প চেষ্টাতেই নিদ্রিত হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যদিও অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য

হওয়া যায় বটে, কিন্তু আবার লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিম্বা সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক উপায় সকলের আশ্রয় লইতে হয়।

আবার অনেক সময় নিদ্রা আনয়ন না করিয়াও **রোগীর রোগ আরোগ্য করা যায়।**

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উইলসন্‌ সাহেবের মতানুযায়ী মেস্‌মেরাইজ্‌ করিবার প্রণালী।

১।—ক্রিয়া পাত্রের সম্মুখে বসিয়া পাত্রকে বলিবেন—যেন সে অনাসক্ত, প্রশান্ত ও স্থির চিত্তে বসিয়া সাধকের বশীভূত হইবার ইচ্ছা করে। কোন প্রকারে অন্য চিন্তা মনে উদয় হইতে না দেয়, এবং তাহার চক্ষু দুটী ক্রিয়া সাধকের চক্ষের উপর রাখিবে, কিম্বা চক্ষু বুজিয়া থাকিবে, অথবা ক্রিয়া সাধক একটী রৌপ্য বা তাম্রের চাকৃতিকে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিয়া নিজ বক্ষের উপর বদ্ধ রাখিয়া, তাহাতে তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে বলিবেন।

ক্রিয়া সাধক নিজে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ তাহার অঙ্গুষ্ঠাগ্রের উপর সংযুক্ত করিবেন। নিজের বাম হস্ত তির্য্যকভাবে তাহার বামহস্ত ধরিবেন, এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ হস্ত ধরিবেন। পাত্র নূতন হইলে তাহার মনে এমন ধারণা করিয়া দিতে হয়; যাহাতে শীঘ্রই তাঁহার বশীভূত হইবার উপযুক্ত হয়।

২।—পাত্রের ভ্রূরমধ্যস্থলে স্থির, ধীরভাবে দৃষ্টি নিয়োজিত রাখিয়া একাগ্রমনে ক্রিয়া পাত্রকে নিদ্রাভিভূত করিবার ইচ্ছা করিতে থাকিবেন। ক্রিয়া পাত্রের ও নিজের হাতের উত্তাপ যতক্ষণ সমান না হয়, সে পর্য্যন্ত অঙ্গুলীতে অঙ্গুলি লাগাইয়া রাখিবেন। উভয়ের হস্তের তাপ সমান হইতে কতক্ষণ লাগিবে, বলা যায় না।

৩।—উভয়ের হাতের উত্তাপ সমান হইলে মেস্‌মেরিক্ ক্রিয়া আরম্ভ করিবেন। পাত্রের মস্তকের উপর লঘুভাবে হাতের তেলো স্থাপনা করিবেন, যেন আপনার করতল দ্বারা তাহার ললাট আবৃত হয় এবং অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগ তাহার মস্তকের উপর ভর রাখিবেন, অথবা এমন ভাবে হস্ত স্থাপন করিবেন, যাহাতে করতল দ্বারা তাহার চক্ষের উপর আবরণ পড়ে এবং অঙ্গুলিগুলি তাহার মাথার চুলের সম্মুখ সীমা পর্য্যন্ত থাকে এবং উভয়ের

মস্তক নিকটবর্ত্তী করিবেন। হাতের কনুই দুটী হাঁটুর উপর স্থাপন করিলে হাত শীঘ্র ভার হইয়া আসে না।

৪।—যতক্ষণ তাহারচক্ষু বুজিয়া না আসে বা পাতায় পাতায় জোড়া লাগিয়া না যায়, ততক্ষণ ক্রমাগত ঐ প্রণালীতে তাহার মস্তকের উপর শক্তি সঞ্চার করিতে থাকিবেন। যদি নিজের নির্ব্বন্ধাতিশয্য থাকে এবং ক্রিয়া পাত্র যদি প্রতিকুলতাচরণ না করে, তবে বশীভূত হইবেই হইবে। খুব বেশী হইলেও আধ ঘণ্টার বেশী লাগে না। ফল কথা যতক্ষণ চক্ষু আবদ্ধ না হয়, ততক্ষণ ক্ষান্ত হইবেন না।

৫।—যখন চক্ষু আবদ্ধ হইবে, তখন কপালের উপর হইতে হাত তুলিয়া অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত করিয়া কিছুক্ষণ ক্রমান্বয়ে উভয় চক্ষু, কপালে, মস্তকের শীর্ষ দেশে, মস্তকের দুই পার্শ্বের এবং উহার পশ্চাৎ ভাগের অভিমুখ করিয়া ধারণ করিবেন, তার পর মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল ও উদরের উপরও ঐ প্রকারে ধারণ করিবেন।

৬।—এই সকল কার্য্য যদি যথারীতি,একাগ্রতার সহিত সম্পন্ন হয়, তবে মেস্‌মেরিক্‌ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

৭।—তার পর মেস্‌মেরিক্‌ শক্তি পাত্রের উপর সঞ্চিত

করিয়া চালনা করিতে হইবে। সঞ্চিত শক্তি চালাইয়া আনিবার সময় অগত্যা পাত্রের নিজ শক্তিও কতকটা সেই সঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

৮।—এই প্রক্রিয়া মস্তকের শীর্ষ স্থানের অল্প পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্মুখ ভাগের দুই বাহু দিয়া আস্তে আস্তে নামাইয়া অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আনিবেন। এক এক বার সাম্‌না সামনি কপাল হইতে মুখমণ্ডলের ও শরীরের উপর দিয়া পেট ও হাঁটু পর্য্যন্ত আনিবেন, কিন্তু যেন মনে থাকে, শরীরের একটু তফাৎ দিয়া হাত চালাইবেন।

৯।—ইহাতেও যদি পাত্র নিদ্রাভিভূত না হয় বা আবার তাহার চক্ষু তাকাইয়া যায়, তবে আধ ঘণ্টা পরে সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিবেন; কিন্তু সাধক যদি তার পরও শক্তি চালনা করেন, তবে ক্রিয়া পাত্রকে মেস্‌মেরাইজ্ করিতে একটু বিলম্ব হইবে। প্রথম প্রথম স্বাভাবিক নিদ্রার মতই দেখা যাইবে; কিন্তু ক্রমাগত চালাইলে মেস্-মেরিক্ অবস্থা পর পর বিকশিত হইতে থাকিবে। পাত্র প্রথম নিদ্রিত হইলে তাহাকে কিছুক্ষণ ঘুমাইতে দিবেন। কোন প্রকার বাধা দিবেন না। তাহার পর আকর্ষণী প্রক্রিয়া চালাইবেন।

১০।—তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে কেমন

বোধ করিতেছে। তখন ক্রিয়া পাত্র আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে, কিম্বা উত্তর না দিয়া ঘুমাইতে থাকিবে, অথবা জাগিয়া উঠিবে। এই তিন অবস্থার এক অবস্থা হইবে। যদি সে উত্তর দেয়, তবে বুঝিবে যে প্রকৃত মেস্‌মেরিক্‌ অবস্থা আসিয়াছে।

১১।—যদি উত্তর দিতে থাকে, তবে পর পর প্রশ্ন করিবেন।

ক—তাহার এই প্রক্রিয়া ভাল লাগিছে কি না।

খ—ইহা অপেক্ষা কোন ভাল প্রণালী বলিয়া দিতে পারে কি না।

গ—কোন গোপনীয় কথা বলিতে চাহে কিনা। কোন উপদেশ দিতে চাহে কিনা।

ঘ—তাহার মাথার ভিতর কোন প্রকার আলো দেখিতেছে কিনা এবং সেই আলো সুসম্পষ্ট কি ছায়ার মত?

ঙ—ক্রিয়া সাধককে দেখিতে পাইতেছ কিনা যদি দেখিতেছ, কোন স্থান দিয়া দেখিতেছ? এবং কি করিলে আরও দৃষ্টি শক্তি স্পষ্ট হয়?

চ—তোমার ও আমার শরীরের অভ্যন্তর ভাব দেখিতে পাইতেছ কি না? আর সেই বিষয়ের ভাবী কোন কথা তোমার বলিবার আছে কি না?

ছ—দূর স্থানে যাইতে পার কি না? এবং পরে কি ঘটিবে, বলিতে পার কি না?

জ—কতদিনে তোমার মনের কথা আমি জানিতে পারিব। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যে ভাবে তাহার নিকট পাইবেন; সেই ভাবে তার পর প্রশ্ন করিতে হইবে অথবা যতক্ষণ দিব্য দৃষ্টি তাহার না হয়, ততক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিতে হইবে।

১২।—যতক্ষণ নিদ্রিত থাকিবে, ততক্ষণ ঘুমাইতে দিবেন। যদি নিজে জাগিতে চাহে বা ক্লান্ত বোধ করে, তবে জাগাইয়া দিবেন। জাগাইবার পূর্ব্বে ঘুমের সময়ের ঘটনাবলি জাগিবার পর ভুলিয়া যাইতে বলিয়া দিবেন।

১৩।—পাত্রকে জাগাইবার জন্য বিপরীত পাশ দিবার উপায়। যথা—পাত্রের চেয়ারের পিছনদিকে দাঁড়াইয়া দুই পার্শ্ব দিয়া তাহার হাঁটু হইতে আরম্ভ করিয়া দুই বাহুর উপর মস্তক পর্য্যন্ত বিপরীত ভাবেপাশ দিবেন এবং মুখের সম্মুখে দ্রুতগতিতে, হস্তাঙ্গুলি সমূহকে উর্দ্ধদিকে চালিত করিয়া জাগাইয়া দিবেন। কদাচ হঠাৎ জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন না। দেরী হইতে থাকিলে সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াও তাড়া লাগাইবেন না। ক্রিয়া পাত্রের সুবিধা মত জাগিতে দিবেন। তাড়াতাড়ি করিবেন না।

মেস্‌মেরাইজ্‌ করিবার আরও অনেক উপায় বা প্রক্রিয়া আছে; তন্মধ্যে উইলসন্‌ সাহেবের মতানুযায়ী পাশ দিবার নিয়ম বলিয়াছি। এক্ষণে নূতন সাধককে দু'চারিটী কথা বলিব।

১।—মনের একাগ্রতা দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যহ কোন একটী নিয়মিত বস্তুতে ধ্যানপ্রবাহ অভ্যাস করিবেন।

এইটীই অতিশয় প্রয়োজনীয় ও কঠিন বিষয়। মনকে স্থির করা অতীব কঠিন কার্য্য। ইহা যোগী ব্যক্তিরও কষ্টসাধ্য।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যখন কহিলেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি
বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব
সুদুষ্করম্ ॥৬।৩৪

হে কৃষ্ণ, মন সদাই চঞ্চল, অজেয় ও দৃঢ়। আমি তাহার রোধ করা বায়ুর নিরোধের ন্যায় দুষ্কর মনে করিতেছি। তখন তিনি বলিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো
দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ
গৃহ্যতে ।।৬।৩৫

তখন তিনি কহিলেন—মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

এই মনকে বশীভূত করিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্ম গ্রন্থে বহু বহু উপায় নির্ণীত হইয়াছে। সে সকল যাঁহারা জ্ঞাত আছেন; তাঁহাদের কোটী কোটী প্রণাম। তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে।

২। ক্রিয়া পাত্রে শক্তি চালনা দ্বারা নিজের জীবনীশক্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহাতে নিজের সমূহ ক্ষতি ও বিপদ আছে সুতরাং অনেক রোগীকে এক দিনে নিদ্রিত করিবেন না। নিজের চিন্তাকে দৃঢ় রাখিবেন। স্বার্থবোধ একেবারে না থাকে। কোন প্রকার থাকিলেই বিপদ। নিজের বাহাদুরী দেখান বা প্রতিপত্তির ইচ্ছা পর্য্যন্ত না থাকে

নবম পরিচ্ছেদ।

রোগী বৃত্তান্ত।

একদিন শীতকাল। শীতকাল হলেও শীত বেশী নয়। কোন স্থানে যাইবার জন্য প্রত্যুষে বাহির হইলাম। অত্যন্ত কোয়াসা হইয়াছে, কোলের মানুষও কষ্টে দেখা যায়। একটু মাঠ পার হয়েই একটা পুকুর। পুকুরের জলটুকু অতি পরিষ্কার, যেন কাকচক্ষু। পুকুরের পাড়ে কোন গাছ আদি নাই। পাড়ে কয়েকজন সাঁওতাল বাস করে। তাহাদের ঘর গুলি তফাৎ তফাৎ। মধ্যে মধ্যে ধান শুখাইবার খামার বা উঠান। খামারগুলি পরিষ্কার নিকান।

আমি পুকুরের পাড়ে উঠিবামাত্র একটা বৃদ্ধা সাঁওতালনী আমার নিকট আসিয়া বলিল "ওরে বাবু দয়া কোরে আমার ঘরকে আয়" বোলে কেঁদে ফেল্‌লে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

একটী কুঁড়ের নিকট গিয়া দেখি; প্রায় ২০।২২ জন সাঁওতাল কুঁড়ের বাহিরে পরিষ্কার মাটীতে বিষণ্নভাবে বসিয়া

কি কথাবর্ত্তা কহিতেছে। আমাকে দেখিয়া কথা বন্ধ করিল। যাহা শুনিলাম, তাহার অর্থবোধ হইল না। তবে রোগীর কথাই হইতেছে, বুঝিলাম।

তার পর কুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি, ঘরখানি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; লাল মাটিদিয়ে বেশ কোরে মেজে ও দেওয়ালের গা পর্য্যন্ত নিকান। দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে এক বৃন্তে দুইটী পদ্মফুল আঁকা। মেজেতে দড়ি দিয়া ছাওয়া একখানি বাঁশের খাটে ময়লা কাঁথার উপর ফরসা কাপড় পাতা, তদুপরি ২০ হইতে ২৫ বৎসরের একটি যুবা মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া শ্বাস টানিতেছে। চক্ষে জল পড়িতেছে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি। শ্বাস প্রশ্বাস উভয় কালেই প্রচুর শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি দূর হইতে শুনা যাইতেছে। নাড়ী আছে, কিন্তু ভাল নয়, স্বল্প বিরাম বা সবিরাম। কপালে ও গলায় ঘাম হইতেছে, জিজ্ঞাসা করায় কহিল, যে দিন অত্যন্ত কোয়াসা ছিল, তার পরদিন হইতে সর্দ্দি ও জ্বর হয়েছে। আজ রাত্রি (কা'ল রাত্রে) হ'তে এইরূপ হয়েছে, আজ্ঞে।

বৃদ্ধা কহিল—হাঁরে বাবু তুই বুল্‌তে পারুস্? ছোক্‌রা কি বে-খেরে মারা যাবে? কোন দেবতা পেয়েছে কি? আমি বলিলাম—আমি দাওয়াই দেবো, দাম দিতে হবে না, খাওয়াইবি কি?

স্ত্রীলোকটী কহিল—দিবি? তুই আমাদের যখন যা বুল্‌বি সব করবো।

বলাবাহুল্য, যখন প্রথমে আমি ঘরে প্রবিষ্ট হই; তখন বাহিরের পুরুষের মধ্যে দুতিন জন ঘরে ঢুকিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন সাঁওতালী ভাষায়; কি, কি ভাষায় ঐ স্ত্রীলোকটীকে কি বলিল। তাহার এক বর্ণও বুঝিলাম না, কিন্তু স্ত্রীলোকটীর মত বদ্‌লাইল। সে আমাকে কহিল—দেখ বাবু! আমাদের ওঝা বুলছে, "তারা দেখ্‌বে" আমি তোর কাছে পরে যাবো। আমার হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া গেল। হায় হায় এই যুবা! কি আর করবো।

আমি যেখানে যাইতেছিলাম, তথাকার কাজ সেরে ফেরৎ আসার সময় আমার সাধ্যমত দ্রুত আস্‌তে লাগ্‌লাম। আর ঐ যুবার ভাবনাই ভাবিতে ভাবিতে আসিতে লাগিলাম, কিন্তু হায় হায় কি আর দেখ্‌বো, এতক্ষণ হয় তো সব লীলাখেলা মিটিয়া গিয়াছে। বড়ই প্রাণটা কেমন কোর্‌তে লাগ্‌লো। তখন বেলা ৯টা ১০টা হয়েছে, কিন্তু মেঘ কোরে থাকার মত আছে।

আসিয়া দেখি—রোগীকে ঘর থেকে পরিষ্কার নিকান থামারে বাহির করিয়া একটা পরিষ্কার মোটা লাল

পেড়ে কাপড় মাটিতে পাতিয়া শোওয়াছে। একটা নূতন মাটির ভাঁড়ে জল দিয়া পরিষ্কার একটা বেদীর উপর বসাইয়া তাহাতে সিঁদুর দিয়াছে এবং বেদীর চারিদিকে সিঁদুর ছড়াইয়াছে। একটী লাল জবাফুল ঘটেরমুখে ও তিন চারটী চারিদিকে ছড়ান আছে। ঘট ও রোগী বেড়িয়া সিঁদুরের ছড়া দিয়াছে। ঘটের সম্মুখে একটা গলাকাটা পায়রা, পড়িয়া আছে। তাহার রক্তে মাটি কতদূর রক্তাক্ত করিয়াছে।

সেই সব সাঁওতাল পুরুষগণ হাত ধরাধরি করিয়া, সেই রোগী, ঘট ও মৃত পায়রাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুর করিয়া মন্ত্র আওড়াইতেছে, আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। অপর একজন সেই গানের সঙ্গে মাদল বাজাইতেছে ও নাচিতেছে। গানের বিরাম নাই, নৃত্যেরও বিরাম নাই, বাজনারও বিরাম নাই, মন্ত্রের অর্থ কিছুই বুঝাযায় না। তবে কাছে কালী ও চণ্ডী, এই শব্দ মাত্র বুঝলাম।

আমি রোগীর নিকট যাইবার চেষ্টা করায়, তাহারা নিষেধ করিল। আমার বাসায় চলিয়া আসাবার সময় দূর হইতে যেন রোগীর অবস্থা কিছু ভাল মনে করিলাম, আহারাদির পর কৌতুহল পরবশ হইয়া যাইয়া যাহা দেখিলাম—আশ্চর্য্য হইলাম। ওঝারা সব তফাতে বসিয়া

আমোদ প্রমোদ করিতেছে। তখন বেলা ১২টা কি ১টা রোগী তাহাদের মাঝে নিরোগ সুস্থ ব্যক্তির মত বসিয়া ভাত খাইতেছে। রোগী বলিতেছে, আর খাব না। ওঝরা খাইতে বল্‌ছে।

আমি রোগী দেখিতে চাহিলাম। তাদের মত হলো না। বল্‌লে কি দেখ্‌বি ও ভাল হয়েছে, কাল দেখুস্‌। আশ্চর্য্য হইলাম।

আমার বোধ হয়, ইহাও মেসমেরিক্‌ ব্যাপার।

সমাপ্ত।

বৈঁচিগ্রাম, জেলা হুগলি,

সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ্ ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কৃত

পুস্তকাবলি

১।	সংক্ষিপ্ত-ভৈষজ্য-রত্ন (রিপার্টরি সহ)	৫৲
২।	পকেট-ভৈষজ্য-সোপান ঐ	১।৷৹
৩।	হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের সম্বন্ধনির্ণয় ও প্রতিকার	৩।৹
৪।	বৃহৎ নিউমোনিয়া-সন্দর্ভ (রিপার্টরি সহ)	২।৷৹
৫।	টাইফয়েড্-ফিবার-চিকিৎসা, সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ই, বি, ন্যাসের, লিডারস্-ইন্-টাইফয়েডের অনুবাদ, বহু রোগী বৃত্তান্ত ও (রিপার্টরি সহ) তৃতীয় সংস্করণ	১।৷৹
৬।	ওলাউঠা-বিজয় (রিপার্টরি সহ)	১।৹
৭।	হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের সাদৃশ্য	১৸৹
৮।	প্লেগ্-চিকিৎসা (রিপার্টরি সহ)	৸৹
৯।	পকেট্-রিপার্টারি (হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের)	৩৲
১০।	প্রসূতি-সহায়	২৲
১১।	চিকিৎসা-সেতু (প্রাকটীস্) প্রথম ভাগ	৬৲
১২।	চিকিৎসা-সেতু দ্বিতীয় ভাগ	৬৲
১৩।	বসন্ত ও হাম চিকিৎসা	১৲
১৪।	অর্শ-চিকিৎসা	।৹
১৫।	এপেণ্ডিসাইটীস্-চিকিৎসা	।৹

১৬।	আত্মানাত্ম বিবেকঃ (অনুবাদ সহ)	I০
১৭।	ধর্ম্মের তিনটী পথ (উৎকৃষ্ট বাঁধান)	II৵০
১৮।	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	৵০
১৯।	বাণ যুদ্ধ	৵০
২০।	মোহ-মুদ্গর (অনুবাদ সহ)	⁄৫
২১।	বিদ্যালয়	⁄০
২২।	শিশুযকৃৎ (যন্ত্রস্থ)	
২৩।	মেস্‌মেরিজম্ বা শক্তিচালনা	১৲

কি কবিরাজ, কি হোমিওপ্যাথ্, কি এলোপ্যাথ্, সকল চিকিৎসকের ইহা অবশ্য পাঠ করা উচিত। যদি রোগী আরোগ্য করিতে চাহেন, তবে অবশ্য পাঠ করিবেন। শিশু লইয়া যাঁহারা সংসার করেন, তাঁহারা এই মেস্‌মেরিমজ শিক্ষা রাখিয়া দেখুন, কি উপকার পান।

২৪।	চিকিৎসা বিজ্ঞান দর্শন	৶০

কোথায় রোগ হয়, কেমন করিয়া আরোগ্য হয়, ঔষধ কি এবং তাহাতে কেমন করিয়া রোগ আরোগ্য হয়। হোমিওপ্যাথিক্, এলোপ্যাথিক্, ও কবিরাজী চিকিৎসা কি? জানা থাকা সকল চিকিৎসকের উচিত। কাহারও উপর কাহারও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। সকলের সুবিধার জন্য মূল্য তিন আনা মাত্র।